বালঢাল

উলট পুরাণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যে পুরাণ উলটে পড়ে
তাকেই বলে উলট্ পুরাণ
যে রথ উলটে চলে
তারই নাম উলটো রথ ।
ডাঙ্গা যখন উলটে পড়ে
তখন বলে উলটো ডাঙ্গা
উলটে গিয়ে পালটে গেলে
হেঁকে বলি উলট্ পালট্ ॥
কম্বলকে উলটে দিলে
বসবে চড়ে গাছে
উলট কম্বল ফুল ফুটেছে
কাঁটা খোঁচা গাছে
টাকা যখন উলটে যাবে
হয়ে যাবে কাটা
দাদা কিন্তু উলটে গেলে
রয়েই যাবে দাদা ।

আষাঢ়
১৩৮৯

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

ঝলমলের নিয়মাবলী

(১) ঝলমল-এর এক বছরের গ্রাহক চাঁদা কমিয়ে ২৪ টাকা করা হল। শারদীয় ঝলমল বা বিশেষ সংখ্যার জন্য আলাদা কোনো টাকা দিতে হবে না। শারদীয় সংখ্যার আনুমানিক মূল্য বারো টাকা। শারদীয়া সংখ্যা রেজঃ ডাকে যাবে।

(২) যে কোনো সময়ে চাঁদা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

(৩) বাংলা মাসের প্রথম অর্থাৎ ইংরাজী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঝলমল প্রকাশিত হয়।

(৪) গ্রাহকরা সময় মতো বই না পেলে দপ্তরে জানালে ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয়।

(৫) ঝলমলের গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডারে এবং নগদে পাঠান যায়। এছাড়া চেকেও পাঠান যায় তবে কলকাতার কোন ব্যাঙ্কের উপর পাঠাতে হবে। 'Jhalmal' এই নামে চেক পাঠাবেন।

(৬) গ্রাহক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর বিভিন্ন বিভাগে লেখা ও ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড লিখতে হবে।

(৭) লেখকেরা যথাসম্ভব ছোট লেখা পাঠাবেন। স্বনামাঙ্কিত পোস্ট কার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। লেখার নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবে না। কোন্ মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়।

(৮) মজার ধাঁধা, হাতে খড়ি, ছবি দেখে গল্প, প্রকৃতির আঙ্গিনায়, চিঠিপত্তর, মফস্বলের টুকিটাকি, খেলাধূলোর প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিভাগে লেখা বা কিছু জানতে চাইলে আলাদা আলাদা কাগজে বিভাগের নাম স্পষ্ট করে লিখে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য নিয়মাবলী

(১) কমপক্ষে ১০ কপি পত্রিকা নিতে হবে।

(২) দশ টাকা জমা রাখতে হবে।

(৩) V. P. P তে পত্রিকা যাবে—ডাক খরচ আমরা বহন করব।

(৪) ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

(৫) V. P. P. ফেরৎ দিলে এজেন্সী বাতিল করা হবে এবং জমা টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে না।

ঝলমল

এ সংখ্যায়

প্রচ্ছদ ছড়া : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় — উলট পুরাণ

—ধারাবাহিক উপন্যাস

* শিশিরকুমার মজুমদার ৯ তুষার বন্দী
* পার্থ সারথি ২৫ দুরন্ত দুংরাজ
* স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০ ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য

—গল্প

* শ্যামলী বসু ৬ রাত তখন আটটা
* কমল বসু ১৭ সুবুদ্ধিই প্রমাণ
* অরুণ দে ২৮ পুরাণের গল্প
* নির্মল বিশ্বাস ৩২ বুদ্ধি বড়
* শান্তনু ভট্টাচার্য ৩৪ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না
* দেবাশীষ সরখেল ৪১ মিণ্টুর জন্য

—নিবন্ধ

* মঙ্গলময় দত্ত ১৬ সিমুলিয়ার সিংহ শিশু
* নারায়ণ চক্রবর্তী ১৯ সৌরজগতের দশম গ্রহ
* প্রদীপ চক্রবর্তী ২২ আবিষ্কারের কাহিনী : ছাতা

—ছড়া ও কবিতা

* পংকজ সাহা ১৪ পাখি—পাখি
* প্রদীপকুমার মিত্র ১৩ পাগলা ঘোড়া
* রমেন রায় ১৪ হাতুড়ে বদ্যি
* রূপক চট্টোরাজ ১৫ মোটা হওয়ার কারণ
* সরল দে ১৫ অদ্ভুত
* রমেশ অধিকারী ১৫ মাছের চাষ
* রাখাল বিশ্বাস ২৪ দুষ্টু নুটুন

—চিত্রকাহিনী

* ইন্দ্রনীল ঘোষ ৪ লম্বু জাম্বু
* ইন্দ্রনীল ঘোষ ১২ ড্রাকুলা
* উজ্জ্বল ও প্রজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ৩৮ হানাবাড়ির রহস্য

—খেলাধুলো

* শচীনকুণ্ডু ৫৬ বিশ্বকাপের বিচিত্র ঘটনা

অর্জুন হাবিব	৫৮	* ঝলমলের খেলাধূলা বিভাগ
স্ট্রাইকার অরূপ দাস	৫৯	* অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
ময়দানে তিনপ্রধান দর্শকদের মন কিন্তু বিশ্বকাপে	৬০	* কৃষ্ণা পাল
দেশবিদেশের খেলাধূলা	৬২	
খেলাধূলোর প্রশ্নোত্তর	৬৩	* শচীন শঙ্কর
মন্তব্য…মন্তব্য…মন্তব্য	৬৪	

—অন্যান্য আকর্ষণ

চিঠিপত্তর	৩
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	২০
কত অজানারে	৪৩
শব্দ-ছন্দ	৪৬
'বল তো ?'	৪৮
মজার ধাঁধা	৫০
শব্দ বর্নাক	৫১
হাতে খড়ি	৫২
মফস্বলের টুকিটাকি	৫৪

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল ঘোষ ও স্বপন রায় চৌধুরী

সম্পাদক :

অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য

সহ সম্পাদক :

পীযূষ রায়

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE, NO. 443/16 (2) T.B.C. (Dated 4th December, 1979)

সম্পাদকীয় কার্যালয়

১, রাজেন্দ্র দেব রোড (ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে)। কলিকাতা ৭০০ ০০৭।

ফোন—৩৪-৭৮০৩

শ্রীসিতাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রগতি প্রিণ্টার্স, ৭৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং পি-৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

[এ মাসের সেরা চিঠি]

এভারেস্টের নাম রাধানাথ শৃঙ্গ করা হোক

সম্পাদক সমীপেষু,

সুনীত রায়ের 'রাধানাথ শৃঙ্গই এভারেস্ট' প্রবন্ধটি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ঝলমলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা, বাঙ্গালী গণিতবিদ্ ও বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পেরে খুব ভাল লাগছে।

গৌরীশৃঙ্গ যে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ এবং তার উচ্চতা ২৯০০২ ফুট তা আবিষ্কারের গৌরব গণিতবিদ্ রাধানাথ শিকদারের প্রাপ্য। কারণ তিনিই এই গৌরীশৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয়ে গণিতবিদ্যার সফল প্রয়োগ করার ফলে আবিষ্কারটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। সেখানে ব্রিটিশ ভারতে তাঁর আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করে কর্ণেল এভারেস্টের নামানুসারে নামকরণ করা হল সর্বোচ্চ শৃঙ্গের। যেহেতু তিনি কর্ণেল এভারেস্টের অধীনে কাজ করতেন, স্বাধীন ভারতে আজ সেই অন্যায়কে আমরা মানব কেন? অক্টরলনি মনুমেন্টের যেমন শহিদ মিনার নামকরণ হয়েছে তেমনি এভারেস্টের নাম বদলে রাধানাথ শৃঙ্গ করা উচিত, আর দেরী নয়।

—কুন্তল মিত্র

'গল্প হলেও সত্যি-চাই'

শ্রদ্ধেয় দাদাভাই,

আমি নিয়মিত "ঝলমল" পড়ি, লেখাগুলো খুব ভালো লাগে বিশেষ করে "হাতে খড়ি" বিভাগটা কিন্তু একটা অভাব বোধ করি এর মধ্যে হচ্ছে" "গল্প হলেও সত্যি" ধরণের কোন লেখা নেই, এ ছাড়া এটা যখন আমাদের ছোটদের পত্রিকা, তখন প্রথম কবিতাটা ছোটদের লেখা হলে আরো ভাল লাগবে, আশা করি এগুলো চিন্তা করবেন। নমস্কার

ইতি—জয়তী সেন (বয়স ১২)

রাজা হব

দাদাভাই,

আমি ও দিদিদের মতো ঝলমল পড়ি। আমার বাড়ীর নাম রাজা।

বড়ো হলে আমি সত্যিকারের রাজা হব। তখনো ঝলমল পড়ব।

ইতি—সুদীপ্ত সেন
(৬ বৎসর)

নতুন সাজের অপেক্ষায়

দাদাভাই,

ঝলমলের নতুন সাজে নতুন আকারে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুশী হলাম। এবং আরো ভালো লাগলো এই দু'মূল্যের বাজারে পত্রিকার নাম আড়াই টাকা থেকে দেড় টাকা করা হচ্ছে দেখে। ঝলমলের নতুন সাজ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে রইলাম। আশা করি ঝলমল পাঠকদের আরো প্রিয় হয়ে উঠবে।

ইতি—তরুণকান্তি বারিক

লম্বু জম্বু

ইন্দ্রনীল ঘোষ

একটা জিনিস দরকার—
এক্ষুনি !
মামার শিকার-এর ঘর থেকে একটা জিনিস এনেছি !
আর একটা ব্যাপারে প্রায় সিওর হয়ে গেছি
একটু পরে .....
গ-র-র-র
হা-লু-ম্
বা-বা-বা-ঘ্ !!
হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !
আমি জানতাম এটা লম্বুর কান্ড !
প্রথমেই খটকা লেগেছিল ! তারপর মামার শিকারের ঘরে গিয়ে যখন দেখেছি শিম্পান্জীর চামড়া নেই, তখনই বুঝেছি !

শুভেন্দু যখন ট্রেন থেকে নামল তখন রাত প্রায় আটটা। ট্রেন থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, না, লোকজন তো কেউই নেই। কেউ কি তাকে নিতে আসেনি? শিবুদা? সেও কি জানে না শুভেন্দু আসছে আজ?

তা ছাড়া শীতের রাত, এর মধ্যেই যেন নিঝুম রাত বলে মনে হচ্ছে, দু'চারটি লোক নামল, দু'চারজন উঠলও বটে। টিনের শেডের তলায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে দু'চারজন লোক ঘুমোচ্ছে। একটা লোক 'গরম চা, চা গরম' হেঁকে চলে গেল কোথায়। তারপরই প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা।

শুভেন্দুর রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছিল। সে আসার দিন ক্ষণ সব জানিয়ে কাকাকে চিঠি লিখেছিল। এতদিন পরে আসছে সে। অবশ্য ওদের লাইনে তিন-চার স্টেশন আগে একটা আপট্রেন বে-লাইন হওয়ায় সব ট্রেনের সময় এলো-মেলো হয়ে গেছে। জংশন স্টেশনে চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল। নইলে তো চারটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যেত সে। এই কাকা কাকীমাই মা বাবা মারা যেতে মানুষ করেছিলেন শুভেন্দুকে। তাই খুড়তুতো বোনের বিয়ের খবর পেয়ে জমানো টাকা তুলে ক'খানা গয়না কিনে দেশে ফিরছিল সে। এমনিতে তার কোন চিন্তা ছিল না। হাঁটার পরোয়া সে করেনা, কতটুক বা পথ? আর মালপত্র বলতে তো ঐ স্যুটকেশটা। নেহাৎ ক'খানা গয়না আছে তাই চিন্তা। পথ ঘাট তো তার মুখস্ত। জীবনের পনেরোটা বছর কেটেছে এখানে, আজই নয় সে দশ বছর দেশ ছাড়া।

আবার এদিক ওদিক দেখে কাউকে না দেখতে পেয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে কাঁকর বিছানো পথে পা রাখল শুভেন্দু।

এতক্ষণ তবু স্টেশনে একটু আলো টিম্‌টিম্‌ করছিল, এবার যেন জমাট বাঁধা অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। রাস্তায় কোন আলো নেই।

পথটা ডানদিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে গেছে শুভেন্দুদের বাড়ির দিকে। বড় একলা লাগছিল শুভেন্দুর। বড় অন্ধকার চারদিক। যদি একটা লোক থাকত সঙ্গে তবে গল্প করতে করতে না হয় যাওয়া যেত। আবার মনে পড়ে গেল শিবুদার কথা।

'খোকাবাবু', অতি পরিচিত আদরের ডাকটা যেন একঝলক মিষ্টি বাতাসের মত ঝাপটা দিল কানে। 'খোকাবাবু যে।'

—শিবুদা! আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠল শুভেন্দু। শিবুদা তুমি? তুমি কেমন আছ? কি আশ্চর্য, ঠিক এই মুহূর্তে তোমার জন্যে মনটা বড় অস্থির হচ্ছিল।

ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল শিবু, শুভেন্দুকে ছোটবেলায় কোলে-পিঠে করে সেই মানুষ করেছিল। গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করে যখন কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশোনা আর চাকরি করা শুরু করল শুভেন্দু, সে রয়ে গেল গ্রামের বাড়িতে ওর কাকার কাছে। ছুটিছাটাতে যখনই গ্রামে ফিরেছে শুভেন্দু শিবুই ছুটে আসত স্টেশনে, ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে।

আবছা অন্ধকারে এগিয়ে এল শিবু, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে। তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি খোকাবাবু, তুমি এ পথ দিয়েই তো যাবে।

ভাগ্যি তুমি এলে! জান শিবুদা, কাউকে দেখতে না পেয়ে এত খারাপ লাগছিল যে কি বলব, আবার ট্রেনটাও এত লেট করল, জংশন স্টেশনে কতক্ষণ যে বসে রইলাম।

কথার উত্তর না দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল শিবু। 'খোকাবাবু' আমার ঠিক পিছু পিছু এসো, কোন চিন্তা নেই। বড় অন্ধকার, সাবধানে চল।'

'শিবুদা, তোমার অসুখ করেছে নাকি? গলাটা অমন শোনাচ্ছে কেন? আরে, তুমি অত এগিয়ে চলছ কেন? একটু আস্তে চল না, কথা বলতে বলতে যাই, ও শিবুদা।'

'খোকাবাবু' ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমার পিছুপিছু এসো, কোন ভয় নেই। আমার একটু এগিয়ে থাকা ভাল, দিনকাল ভাল নয়, নজর রাখতে রাখতে চলছি।'

শুভেন্দুর যেন কেমন লাগে ব্যাপারটা। শিবুদা অত হন্‌হনিয়ে চলছে কেন? তা ছাড়া হাত থেকে সুটকেশটাও তো দিল না।

'বাঁদিকে গর্ত, ডানদিকে বড় গাছের গুঁড়ি, ধাক্কা খেও না যেন। গত বোশেখের

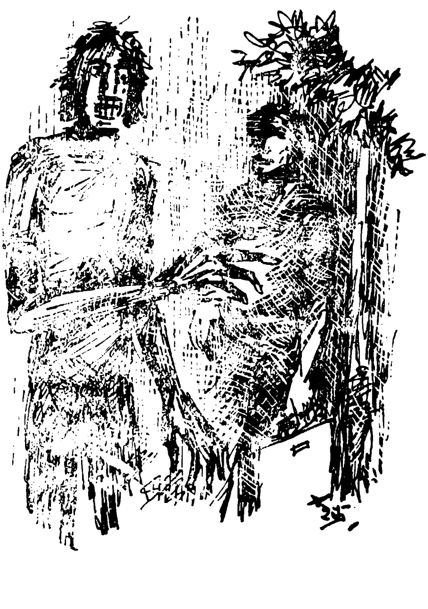

ঝড়ে উপড়ে গিয়েছিল গাছটা'—বকবক্ করে এগিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল শিবু।

দূরে একটা কালভার্টের পাশে দেখা গেল কয়েকজন লণ্ঠন হাতে মানুষের জটলা। উত্তেজিত স্বরে কি যেন বলাবলি করছে তারা। কাকাবাবুর গলা না? আশ্চর্য হল শুভেন্দু। আরে শিবুদাই বা গেল কোথায়! একটু এগিয়ে গিয়ে শুভেন্দু ডাকল, 'কাকাবাবু' আমি এসে গেছি।'

শুভেন্দুর কাকা নিবারণ মুখুজ্যে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন, 'শুভো, তোর ট্রেন কখন এল? অন্ধকারে এতটা পথ এলি কি করে তুই! স্টেশনে তিন তিনবার লোক পাঠালাম, তা কেউ বলতেই পারল না কখন ট্রেন আসবে। ওরে, ও কেষ্ট, ও রামধন, দাদাবাবুর হাত থেকে সুটকেশটা নে বাবা, এতটা পথ হেঁটে এসেছে। আবার এদিকে যে কি কাণ্ড, ঝামেলা যত কি আমার কপালেই জোটে? আবার থানায় খবর পাঠিয়েছি।'

'কি হয়েছে কাকাবাবু' খুবই আশ্চর্য হল শুভেন্দু, থানায় কি খবর পাঠাচ্ছ আবার।

'আর বলিস না বাবা, মাস তিনেক যে এদিকে কি চোরের উপদ্রব, আর রাহাজানি বেড়েছে কি বলব। তোর জন্যে তো ভেবে অস্থির হচ্ছিলাম। আবার লণ্ঠন দিয়ে লোক পাঠাচ্ছিলাম স্টেশনে, তারা ফিরে এসে খবর দিল কালভার্টের তলায় ভূত গোঁ গোঁ করছে। বোঝ কাণ্ড। ভূতে আবার গোঁ গোঁ করবে কি বলত? লোকজন আলো নিয়ে এখানে এসে দেখি—এই দুই ব্যাটা পাকা গুণ্ডা মুখ চিনি ওদের, মুখে মুখোস এঁটে, কোমরে ভোজালি, মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করছে। হয়ত কোন রকমে খবর পেয়েছিল তুই আসছিস। সঙ্গে গয়না টাকাকড়ি থাকবে—উঃ ভগবান রক্ষে করেছেন তোকে। দুর্গা। দুর্গা। শিউরে উঠলেন নিবারণ মুখুজ্যে।

কথা শেষ হতে না হতে লোক দুটো চোখ খোলে, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বলে ওঠে, 'ভূত! ভূত!'

কাকাবাবু ধমকে ওঠেন 'ভূত? ভূত কোথায়। এবার জেলে গিয়ে ঘানি ঘোরাও। পাক্কা শয়তান। এদের ওপর আমার ক'দিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, কি বলব বল? প্রমাণ ছিল কোথায়?'

একজন আবার ধরা গলায় বলে উঠল, 'এখানে, এখানে কালভার্টের ওধারে ভূত দাঁড়িয়েছিল আমাদের পথ আগলে। উঃ কি ভীষণ! শিবু, শিবু দাঁড়িয়েছিল ওখানে।'

হঠাৎ যেন চমকে ওঠেন নিবারণ মুখুজ্যে। 'কি বললি, শিবু?' শিবু দাঁড়িয়েছিল ওখানে?

চমকে উঠল শুভেন্দুও। 'শিবুদা? শিবুদার কি হল কাকাবাবু? সে গেল কোথায়?'

বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নাড়লেন নিবারণ মুখুজ্যে। 'কি বলব বাবা?' শিবে আজ থাকলে, কখন ছুটত তো তোকে স্টেশন থেকে আনবে বলে। এই তো বর্ষার সময় পিছনের বাগানে সাপে কাটল তাকে। তোকে আর লিখিনি সে কথা, কষ্ট পেতিস তাই। চল বাবা, বাড়ি চল। তোকে বড় ভালবাসত। সে মায়া এখনো কাটেনি। আজ তোর প্রাণ বাঁচিয়েছে সে।'

কোন কথাই যেন কানে ঢুকছিল না শুভেন্দুর। কাকাবাবুর মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল সে। এক অলৌকিক স্নেহ বন্ধনের কথা স্মরণ করেই হয়ত চোখে জল ভরে এল তার।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল ও, হঠাৎ মনে হল দূরে কোথায় যেন বহু লোক একসঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। ওদের কথার সঙ্গে ওদের পায়ের আওয়াজও যেন শোনা যাচ্ছে। ওরা আসছে উত্তর থেকে। উত্তর থেকে আসছে কারা! ও কি ভুল শুনছে! হাতের কাজ ফেলে ছুটে বাইরে বার হয়ে গেল ঠুলা পাশাং। অবাক হয়ে দেখল, দালখেন পাহাড়ের সাদা চূড়াগুলো পিছনে রেখে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে একদল লামা। শীতে তারা তাদের হাত জোব্বার মধ্যে ভরে রেখেছে! মাথার টুপিতে কান ঢেকে ভগবান তথাগতের স্তব গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। সবার মাথা নীচু।

দালখেন গুম্ফার কাছে এসে মুখ তুলে তাকাল ওরা। সামনেই সারি সারি তাঁবুগুলো দেখে যেন একটু থমকে গেল। সে কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের জন্য। তারপর এক-এক করে ওরা সবাই ঢুকে গেল গুম্ফার মধ্যে। বাদে একজন, সে কিন্তু সোজা এগিয়ে এল তাঁবুর দিকে।

এ তবে নিশ্চয়ই উত্তর কাশীর লামা। বুঝতে পারল ঠুলা পাশাং। কনক-শম্ভুনাথজী থেকে ফিরে এল খালি হাত পায়ে। তার মানে ওখানে ওরা পৌঁছতেই পারেনি। এ তবে তো ভীষণ খারাপ হল।

এক ছুটে ও তাঁবুর মধ্যে ঢুকে অলোককে ধাক্কা দিল, সাহাব, এ সাহাব, ওঠ ওঠ। উত্তর কাশীর লামা আসছে একলা। লামারা কেউই কাউকে নিয়ে

আসতে পারেনি। ব্যাপার খুব খারাপ মনে হচ্ছে। কোথায় উত্তর কাশীর লামা? ব্যস্ত হয়ে অলোক জিজ্ঞাসা করল, তাকে এখানে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি, আমাদের ভীষণ দরকার।

তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে উঠে ও অন্য সবাইকেও তুলে দিল। সবাই আপন আপন ব্যাগ ভাঁজ করে ফেলল। ঠুলা পাশাং বলল, উত্তর কাশীর লামা গুম্ফার দিক থেকে এদিকেই আসছে। এখুনি এসে পড়বে। ওকে তোমরা ছেড়না সাহেব। কনকশম্ভুনাথজীর পথ ওই শুধু জানে। ওকে ছাড়া তোমরা সেখানে যেতেই পারবে না।

ঠুলা পাশাং আর দাঁড়াল না। যেমন এসেছিল তেমনি হুড়মুড় করে বার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁবুর দরজায় উঁকি দিয়ে দাঁড়ালেন যিনি তার পোশাক আশাক দেখে তাকে সাধু বলে বোঝা মুশকিল! পরনে তার পাহাড় চড়ুরেদের মতনই পোশাক। শুধু টুপি খুলতে দেখা গেল ওঁর মাথা নেড়া। বয়স ওর বড় জোর চল্লিশের কাছাকাছি। শান্ত গলায় উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?

উত্তরে ওরা প্রায় সবাই একসঙ্গেই বলল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হেসে অলোক বলল, সত্যি বলতে কি আপনার আসার পথ চেয়েই যেন আমরা এখানে বসে আছি, উত্তর কাশীর লামা। আমরা সরকারের তরফ থেকে বলেছি কনকশম্ভুনাথজীতে বন্দী যাত্রীদের উদ্ধারের কাজে। ভিতরে এসে বসুন আপনি। আমরা আপনার সাহায্য চাই।

তাঁবুর ভিতরে ঢুকে একপাশে ধপ করে বসে পড়লেন উনি। কারও সঙ্গে কোনো পরিচয় না করেই জিজ্ঞাসা করলেন, কখন রওনা দিতে চান আপনারা?

হাররাজিন্দার এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি কারও সঙ্গে। হঠাৎ উত্তর দিল, কে জানে, ভগবানই জানেন, আমরা কখন রওনা দিচ্ছি। ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সাধুসন্ত লামাদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে মনে হচ্ছে। হয়তো রওনা দেবার আগে গ্রহনক্ষত্রের ব্যাপারটাও আগে বুঝে নিতে হবে।

একথা শুনে অবাক উত্তর কাশীর লামা। এক-এক করে সবার মুখের দিকে তাকালেন। অন্য কেউ কিছু আর বলার আগেই অলোক সমস্ত প্রোগ্রামটা ওঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল। বলল, আমাদের উপরে ভোরেই বার হয়ে পড়ার নির্দেশ আছে। আমরাও তার জন্য প্রস্তুত। এখন যখন আপনিও এসে পড়েছেন এখানে, তখন আপনার সুবিধা অসুবিধার কথাও আমাকে ভাবতে হবে।

একথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন উত্তর কাশীর লামা। স্পষ্ট ভাবে বললেন, না না, কারও ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কথা ভাবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আর কোন প্রোগ্রাম পেছবে না। সকালেই রওনা হব আমি। এখন চারটে বাজে, ঠিক ছটায় আমি প্রস্তুত থাকব। ঔষধপত্র, পোশাক-আশাক, আর পাহাড় তো চড়ার প্রচুর সরঞ্জাম আপনারা এনেছেন সঙ্গে করে? একথা জিজ্ঞাসা করাই ভুল। কারণ আমি ক্যাপ্টেন খিলনকে চিনি। তাঁর কোন কাজেই ভুল হয় না। ঠিক আছে, এখন আমি পুরো দু'ঘণ্টা ঘুমাব। কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। ঠিক ছটায় যাত্রা। যান আপনারা তৈরি হয়ে নিন গিয়ে। শুধু যাবার সময় তাঁবুর দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যাবেন।

কেউ কোন কথা বলার আগেই উনি

সামনের স্লিপিং ব্যাগটা টেনে নিয়ে পাতলেন মেঝেতে। টান দিয়ে পা থেকে ভারী বুট দুটো খুলে ফেললেন। ব্যাগে পা গলিয়ে দিয়ে শোবার উপক্রম করলেন। তখনি এক হাতে প্লেটে খানকতক টোস্ট আর ওমলেট নিয়ে অন্য হাতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের মগ নিয়ে সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল ঠুলা পাশাং।

কোন কথা না বলেই গোগ্রাসে গিলে ফেললেন সব খাবার উত্তর কাশীর লামা। চায়ের মগে দু'চার চুমুক দিয়ে আঃ বলে একটা শব্দ ছাড়লেন। চা-টা শেষ করেই স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে নিজেকে বন্দী করলেন। অন্যরা তাঁবুর পর্দা টেনে দিয়ে বাইরে বার হয়ে গেল।

দু'ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রার বাকি আয়োজন শেষ করে ফেলল হারজিন্দার আর গোম্বু। হাতে কাজ পেয়ে হারজিন্দার আর বকছে না। মুখ বুজেই কাজ করছে। এখন ও একেবারে অন্য মানুষ যেন!

হিদায়েৎ আর একটা রুকস্যাক গোছালো উত্তর কাশীর লামার জন্য। সেটা খুবই হাল্কা। তাতে রাখল কিছু টিনের খাবার আর কিছু ওষুধ। এ ছাড়াও পাহাড়ে যা কাজে লাগে এমন সরঞ্জামও দিতে ভুলল না।

অলোক আবার পোর্টার নিয়ে পড়ল কাকে কি করতে হবে, কোন মাল আগে যাবে। কোনটা পিছনে, কে কি বইবে সব কিন্তু আবার সবাইকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হল।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় দালখেন গুম্ফার ভিতর থেকে বাজনার আওয়াজ ভেসে এল। বড় লামা বোধ হয় ভগবান বুদ্ধের পূজা শুরু করেছেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ক্যাম্পের সবাই এসে পড়ল।

ক্যাম্পের পুরো ভার চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে, রওনা দেবার জন্য সকলেই তাঁবুর সামনে জড়ো হল। ঠুলা পাশাং সেখানেই সবাইকে গরম চায়ের সঙ্গে খাবার পরিবেশন করল। খাওয়া শেষ হতে হতেই ঘড়িতে ২টা বাজল।

তখন ও উত্তর কাশীর লামার দেখা নেই। তিনি সেই যে শুয়েছেন, আর বাইরে আসেন নি। গত কদিন প্রচণ্ড ধকল গিয়েছে ওঁর ওপর দিয়ে, একথা এখানে সবাই জানে। একটুও বিশ্রাম না নিয়েই তাঁকে আবার রওনা হতে হবে এই দুর্গম পথে। কারণ, তাঁকে ছাড়া সোজা পথে কনকশম্ভুনাথজীতে পৌঁছনো যাবে না।

ওঁরই দেরী দেখে একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হারজিন্দার বিরক্ত হয়ে বলল, আমি যাচ্ছি তোমাদের ঐ লামাকে ডেকে তুলতে। এ তো দেখছি সব ব্যাপারেই আমরা সময় থেকে ক্রমে পিছিয়ে পড়ছি! এখন তাঁকে ডেকে তুললে কখন তিনি রওনা হবেন শুনি?

ওর কথা শেষ হবার আগেই তাঁবুর পর্দা উঠে গেল। বাইরে এসে দাঁড়ালেন উত্তর কাশীর লামা। পথ চলার জন্য তিনি তৈরি। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কার এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি। কে প্রস্তুত নয়? না না, প্রোগ্রাম থেকে আমরা এক চুলও এদিক ওদিক হব না। আমাদের উপরে যে অন্যের বাঁচা মরা নির্ভর করছে। চলুন হাঁটা আরম্ভ করা যাক। পিছনে যিনি আছেন তিনি পিছন পিছনই আসুন। পাহড়ের তলে তার সঙ্গে আমরা আবার মিলব।

অবাক হয়ে হারজিন্দার বলল, আপনার ব্রেকফাস্ট? (চলবে)

ব্রাম স্টোকার

ড্রাকুলা

চিত্র ও নাট্য : ইন্দ্রনীল ঘোষ

বাঁচার একমাত্র উপায় !!
এবার যে কোরেই হোক ষ্টেশনে পৌঁছতে হবে !
ঐ রক্তপিশাচদের হাত থেকে আমাকে — বাঁচতেই হবে !
10
ক্রমশ :

পাখি—পাখি

পঙ্কজ সাহা

সেই পাখি
সাদা পাখি
আহা পাখি বন্ধুরে

সাদা পাখি
কালো পাখি
উড়ছে যে রোদ্দুরে

আয় পাখি
দানা পাবি
আয় পাখি
গান গাবি
আয় আয় আয় পাখি
আয় পাখি আয়রে
আয় পাখি
গল্পে অল্পে
মন তোর
রেখে যাবি
মেঘে মেঘে
সোনাঝরে
পাখি—পাখি নাম ধরে
ডাকছি যে আয়না
এত ডাকি কেন তবু
কানে তোর যায় না।

পাগলা ঘোড়া

প্রদীপ কুমার মিত্র

এই ঘোড়াটা পাগলা,
সবাই ওকে আগলা।
ছাড়া পেলেই ছুটবে যে!
লাফিয়ে পিঠে উঠবে যে!
বিপদ ভুলে,
চার পা তুলে—
লাগাম খুলে গড়াবে।
ভোঁদড় ছানা,
দেখলে নানা—
নিন্দে শুধু ছড়াবে।

!! হাতুড়ে বদ্যি !!

রমেন রায়

বুক কার ধড়পড়ে
নাকে কার সর্দি?
চলে এস মোর কাছে
আমি বড় বদ্যি।
গেঁটে বাতে ভুগে ভুগে
গাঁটে কার ব্যথারে?
পা-ধরে টেনে তবে
হাত তুলে নাচারে।
ভাঙ্গা ঠ্যাং-এ শুয়ে কেরে?
নিয়ে আয় এখেনে,
দড়ি আর পেরেকেতে
মেরামত দেখে নে।
দাঁত ব্যথা কাঁদে কেরে?
শুয়ে পড় চটপট,
চিমটে লাগিয়ে দাঁতে
দেব তুলে পট্‌পট।
ছেলে হও মেয়ে হও
হও যদি বৃদ্ধ,
মোর কাছে নেই ভেদ
হাতুড়িতে সিদ্ধ।
সাদা জ্বর কালা জ্বর
পুরোন কি টাটকা,
পেরেকেতে ঠুকে দিয়ে
দেবো করে আট্‌কা।

মোটা হওয়ার কারণ

রূপক চট্টোরাজ

ঠ্যাং তুলে হেঁকে ডেকে
ব্যাঙ বলে হাতিরে,
চোখ জোড়া ক্ষুদে ক্ষুদে,
মোটা কেন ছাতিরে ?
পেট পুরে খাস অত
পাস কার খাতিরে—
দ্যাখ্ ঘুরে বন জুড়ে
আছে কেউ সাথী রে ?
ছোট ছোট পোকা খেয়ে,
খেলি পাঁক-মাঝেতে
লাফ দিয়ে চলি ফিরি,
দিন রাত সাঁঝেতে।

তাই শুনে শুঁড় নেড়ে,
দোলে সেই হাতিটা
গোটা গোটা কলাগাছ
খেলে হবে ছাতিটা,
খেয়ে দেয়ে বনে বনে
ছুটে হেঁটে চললে
হয়ে যাবে হজমটা,
সেই হাতি বল্‌লে।

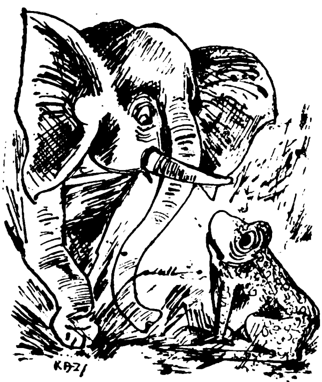

অদ্ভুত

সরল দে

অদ্ভুত লোকটার অদ্ভুত হবি,
উদ্ভট খেয়ালের হেঁয়ালি যে সব-ই।
ঘরে তার ছাদ নেই, খিল নেই দ্বারে ;
আকাশের নীল ছেঁকে রেখে দ্যায় ভাঁড়ে।
টুকটাক জমছেই এটা আর ওটা,
শিশিতেই ভরপুর শিশিরের ফোঁটা।
বৈশাখী ঝড় আর মৌসুমী হাওয়া—
এ সবের স্যাম্পেল চাই তার পাওয়া।
কাজ কাজ করে তার নেই হুটোপুটি,
ঘরে টইটম্বুর একরাশ ছুটি।

অদ্ভুত লোকটার অদ্ভুত হবি,
একদিন তার কাছে গিয়েছিল ববি।
অদ্ভুত শখ বটে, রেখেছিল শেষে—
ববিটার হাসিটাও ভ'রে সুটকেসে !

মাছের চাষ

শ্রীরমেন অধিকারী

পুকুর মাঝে হাজার টাকার
ছেড়ে রুইয়ের পোনা,
ছ'মাস পরে জল শুকিয়ে
দিলেন মালিক গোণা।

গুণ্‌তে গিয়েই মালিক মশাই
উল্টে দিলেন ঠ্যাং,
মাছ কোথায় ? পুকুর ভর্তি
শুধুই কোলা ব্যাং !!

সিমুলিয়ার সিংহ শিশু

মঙ্গলময় দত্ত

মেট্রোপলিটান স্কুল।

ক্লাস চলছে। ক্লাসের একটি ছেলে পড়াশুনায় বড়ই অমনোযোগী। ছেলেটি পড়া বলতে না পারায় শিক্ষকমহাশয় তাকে নির্মমভাবে প্রহার করছেন। পিঠের উপর বেতের পর বেত পড়ছে। ছেলেটির উপর অমানুষিক নির্যাতন দেখে আর একটি ছেলের মন বড়ই ব্যথিত হয়ে উঠলো। ছেলেটির নাম নরেন্দ্রনাথ। ব্যথিত ও উত্তেজিত সহপাঠী নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন, শিক্ষক মহাশয়কে বাধা দেবার অধিকার কি তার আছে ?

কিন্তু শিক্ষক মহাশর প্রহারের সময় যে বিকৃত ও অপরূপ মুখভঙ্গী করছিলেন, তা দেখে নরেন্দ্রনাথের হাসি পেয়ে গেল। বেশ জোরে হেসে উঠলো সে। সে হাসির মধ্যে ছিল শিক্ষকের প্রতি উপহাস।

আর যায় কোথা। নরেনের এই অশিষ্টাচারে শিক্ষক মহাশয় খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। এগিয়ে এসে নরেনের চুলের মুঠি ধরে তার গালে কষে দুই চড় দিয়ে গর্জে উঠে বললেন, আমার কাছে বেয়াদপি। বল্, আর হাসবি না।

মাথা নুয়ে গুম হয়ে নরেন দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা নেই তার মুখে। এই নীরবতায় শিক্ষক নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করলেন। ভাবলেন, ছেলেটি তাকে উপেক্ষা করছে। তার জেদ চেপে গেল, ছেলেটিকে শায়েস্তা করতেই হবে। বেদম প্রহার করতে করতে তিনি নরেনের কান ধরে এমন জোরে টান দিলেন যে, কান ছিঁড়ে রক্ত ঝরতে লাগল ঝরঝর করে।

আর সহ্য হল না নরেনের। সিংহ-শিশুর মতো গর্জে উঠলো সে—'খবরদার বলছি, আর মারবেন না। এভাবে আমাদের মারবার অধিকার কি আছে আপনার ?'

ঠিক সেই সময় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর যাচ্ছিলেন বারান্দা দিয়ে। নরেনের দৃপ্তকণ্ঠে চমকে উঠে তিনি থেমে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসে দৃঢ়স্বরে তাঁকে বললে, দেখুন স্যার কিভাবে মেরেছেন আমাকে মাষ্টার মশায়, এ রকম যদি হয় এবং এর যদি প্রতিকার না হয়, তাহলে এ স্কুল ছেড়ে আমি চলে যাবো। নরেনের কানের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন কোমলপ্রাণ বিদ্যাসাগর—উঃ! এ লোকটা শিক্ষক না পাষণ্ড। শিক্ষকের এই অমানুষিক ব্যবহারে তাঁর স্কুলের যে বদনাম হবে। উত্তেজিতভাবে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে তিরস্কার করলেন শিক্ষককে—"তুমি মানুষ না পশু ? শিক্ষকের কর্তব্য না বুঝেই এসেছো শিক্ষকতা করতে ? এটা খুন করবার জায়গা নাকি ? সাবধান, তোমার ব্যবহারে আর যদি কোনদিন এ ধরনের কোন ত্রুটি দেখি, তবে সেই মুহূর্তেই তোমাকে তাড়িয়ে দেবো।"

এর পর বিদ্যাসাগর নরেন্দ্রনাথকে অনেক সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়ে ক্লাসে যেতে বললেন। বিদ্যাসাগরের স্নেহস্পর্শে ও ন্যায়বিচারে মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল নরেনের। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার নৈতিক সাহস ক্লাসের আর কোন ছেলের ছিল না, অথচ নরেনই ছিল ক্লাসের সব ছেলেদের চেয়ে ছোট। বিশেষত্ব এইখানেই তার।

ধনে মানে যশে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে উত্তর কলিকাতার সিমুলিয়ার দত্তবংশ ছিল সেকালে বিশেষ উন্নত। তার সমৃদ্ধির কথা ফিরতো লোকের মুখে মুখে। নরেন্দ্রনাথ এই বংশেরই ছেলে। এই নরেন্দ্রনাথই হচ্ছেন বীর সন্ন্যাসী কর্মযোগী মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ।

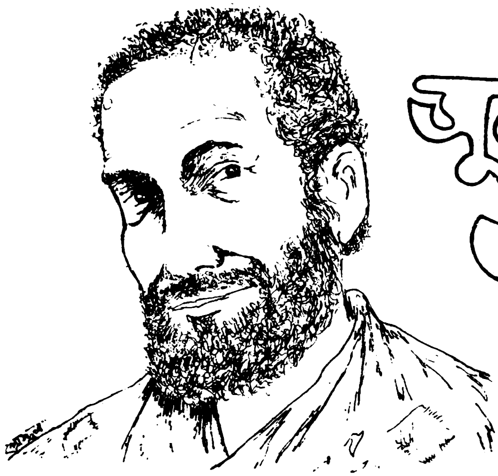

মুদ্রাই প্রধান

কমল বসু

সুবর্ণপুরের রাজা ছিলেন সত্যজিৎ। প্রজাকল্যাণে রাজ্যশাসনে দুর্নীতি দূর করায় সব সময়ই মনোযোগ রাখতেন।

একদিন তাঁর দরবারে দ্বাররক্ষীর অনুমতি নিয়ে একজন লোক এলেন। জামাকাপড় ও চেহারা গরীব-দুঃখীজনের মতন। সে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করলেন, আমার নাম রাখোহরি। নগরের সীমান্তে শ্রীগ্রামে আমার বাড়ি। কয়েকমাস যাবৎ আমার স্ত্রী বড় কঠিন অসুখে ভুগছে। গরীব তাই অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে কিছু অর্থ সাহায্য করেন তাহলে বৌ-এর চিকিৎসা করে জীবন রক্ষা হয়।

রাজা সত্যজিৎ সঙ্গে সঙ্গে অনুদত্ত নামক একজন চরকে ডেকে দু'টি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, তুমি রাখোহরির সঙ্গে তাঁর বাড়ি যাও। রাখোহরির বৌ'-এর বড় অসুখ, একথা সত্যি হলে তুমি তখন তার হাতে এ দু'টি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবে।

'যথা আজ্ঞা' বলে অনুদত্ত রাখোহরির সঙ্গে চললেন। কিছু পথ যাবার পর রাখোহরি বললেন, আপনি দয়া করে একটি স্বর্ণমুদ্রা নিজের পকেটে রাখুন আর একটি স্বর্ণমুদ্রা আমায় দিয়ে ফিরে যান।

অনুদত্ত এ প্রস্তাবে রাখোহরির পিঠ চাপড়ে রাজসভায় ফিরে এসে বললেন, সত্যি-সত্যিই রাখোহরির বৌ-এর কঠিন অসুখ, আপনার আজ্ঞামতন দু'টি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছি।

পরদিন রাজা সত্যজিৎ তাঁর পাত্র-মিত্রদের বললেন, অনুদত্ত জানিয়েছে, সত্যিই রাখোহরির স্ত্রীর অসুখ কিন্তু এখন আমার ভাবনা হচ্ছে যে রাখোহরি তো গরীব লোক। সে কি আর এতদিন পরে দু'টি পয়সার মুখ দেখে বৌ-কে কবিরাজ দেখাবে, খাওয়া-দাওয়া ফুর্তি করেই পয়সা উড়িয়ে দেবে। আর পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় বিনা চিকিৎসায় বৌ বেচারী মারা পড়বে।

পাত্রমিত্ররা 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বললেন। সত্যজিৎ তখন চারুদত্ত নামে অন্য এক চরকে ডেকে রাখোহরির বাসস্থানের নির্দেশ দিয়ে বললেন, রাখোহরির স্ত্রীর বড় অসুখ। তোমাকে এই দশটি রৌপ্য-মুদ্রা দিলাম। এ দিয়ে যাতে তার স্ত্রীকে

ভালো কবিরাজ দিয়ে ভালোমতন চিকিৎসা হয় তার ব্যবস্থা কর।

'যথা আজ্ঞে' বলে চারুদত্ত রাজাকে সম্মান জানিয়ে চলে গেলেন। রাখোহরির বাড়ি গিয়ে চারুদত্ত দেখলেন বেশ ভালো গতর নিয়েই রাখোহরির স্ত্রী ঘরের কাজ-কর্ম করছেন। শরীরে অসুখ নিয়ে তো নয়ই এমন কি শরীর খারাপের কোন লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না।

চারুদত্ত বললেন, কি রাখোহরি, তুমি অমন মিথ্যে করে বৌ-এর অসুখ বলে রাজার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছো! এ বড় অন্যায়।

ভারি বিনীতভাবে রাখোহরি বললেন, আমি গরীব। কোন উপায়ান্তর না পেয়ে....।

—থামো, থামো, গরীব বলে কি তোমার সব অন্যায় মাপ হয়ে যাবে? চারুদত্ত ভাবলেন এখন আমি যদি নিজেই দশটি রৌপ্যমুদ্রা নিই তাহলে মুস্কিল আছে। রাজার আবার কি খেয়াল চাপবে হয়তো আর একজন চরকে পাঠাবেন। তাহলে এই ঠিক করি ভেবে চারুদত্ত রাজার দেওয়া দশটি রৌপ্যমুদ্রার পাঁচটি নিজের পকেটে রেখে বাকিটা রাখোহরিকে দিয়ে বললেন, মনে থাকে যেন রাজার কোন চর যদি আবার আসে তাহলে তাকে বলবে তোমার বৌকে কবিরাজ দিয়ে দেখানো হয়েছে। বৌ সুস্থ হয়ে উঠেছে। অন্যরকম কথা বললে মজাটি টের পাবে। কি অন্যায় করেছো তা তো তুমি নিজেই জানো। হুঁ, হুঁ, বুঝেছ!

কয়েকদিন পর রাজা সত্যজিৎ দেবদত্ত নামে আরো একজন চরকে পাঠালেন রাখোহরির বৌ-এর পথ্য হিসাবে দশটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে আসার জন্য।

রাজ আজ্ঞা মত দেবদত্ত রাখোহরির বাড়ি গিয়ে দশটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বললেন, আপনার স্ত্রীর পথ্য হিসাবে এই মুদ্রাগুলো গ্রহণ করুন।

রাখোহরি গ্রহণ করলেন হাসতে হাসতে।

—আচ্ছা ঐ যে স্ত্রীলোকটি যিনি ঘোমটা মাথায় দিয়ে কাজ করছেন, উনি কে?

আমার স্ত্রী।

—ওনার না কঠিন অসুখ?

—ঠিক আছে, আপনি দশটি রৌপ্য-মুদ্রা থেকে পাঁচটি নিয়ে ফিরে যান, রাখোহরি বললেন।

'আমি ঘুষ নিই না' বলে দেবদত্ত গম্ভীর হয়ে এবং মনে মনে হেসে চলে গেলেন। ঠিক গেলেন না। ঐ গ্রামেরই কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি রাখোহরির স্ত্রীর চিকিৎসা করছেন?

—পাগল নাকি? রাখোহরির বৌ কবে মারা গেছে আর রাখোহরিও গ্রাম ছাড়া। কবিরাজ মহাশয় বললেন।

'ঠিক আছে' আপনি কথাটা পাঁচ কান করবেন না, বলে দেবদত্ত রাজদরবারে ফিরে গেলেন।

রাজা সত্যজিৎকে নিভৃতে সব কথা বললেন দেবদত্ত এবং নিজের অনুমানটাও জানালেন।

পরদিন রাখোহরি রাজদরবারে এলেন। জামার আস্তিন থেকে বের করলেন এক উত্তরীয়। উত্তরীয় সকলেই চেনেন। দরবারে সকলের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। রাখোহরি তাঁর পরচুল, নকল গোঁফ দাড়ি খুলে হেসে নিজের বসবার আসনে গিয়ে বসলেন।

—এ কি, ইনি যে রাজমন্ত্রী সুবুদ্ধি।

(২০ পৃষ্ঠায় দেখ)

সৌর জগতের দশম গ্রহ

নারায়ণ চক্রবর্তী

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই বলে আসছেন যে সৌরজগতে দশম বা একাদশ গ্রহ থাকা একেবারেই অসম্ভব নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্লস কোয়ালের আবিষ্কার তাঁদের সেই ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই চার্লস কোয়ালই বৃহস্পতির ১৩ নম্বর আর ১৪ নম্বর চাঁদের অস্তিত্বের ঘোষণা করেছিলেন সর্বপ্রথম। তার আগে জানা ছিল যে বৃহস্পতির চাঁদের সংখ্যা বারো।

১৯৭৭ সালের ১৮ই এবং ১৯শে অক্টোবর তারিখে অতি আধুনিক টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করবার সময়ে চার্লস কোয়াল শনি ও ইউরেনাস, এই গ্রহ দুইটির মাঝখানে সূর্য প্রদক্ষিণরত একটি উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর এই আবিষ্কারের কথা বিজ্ঞানীমহলকে জানিয়ে দিলেন।

এই খবর পাওয়ামাত্র বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গেল। আরিজোনার জ্যোতির্বিজ্ঞানী টম গেহ্‌লেস জানালেন যে তিনিও ১১ ও ১২ অক্টোবরে তোলা আকাশের ফটো প্লেটে ঐ উজ্জ্বল বস্তুটি দেখতে পেয়েছেন। তবে কোনো গুরুত্ব দেন নি। এর পর ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর তারিখে আকাশে সঞ্চরণশীল ঐ বস্তুটির ফটো তোলা হয়।

এর পরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে এই নতুন আবিষ্কার নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হ'য়ে গেল। কেউ কেউ রায় দিলেন যে ঐ উজ্জ্বল বস্তুটি আসলে একটি ধূমকেতু। কিন্তু এই রায় ধোপে টিঁকল না, কারণ বস্তুটির সূর্যপরিক্রমার যে ভ্রমণবৃত্ত তা অন্যান্য গ্রহের মতোই প্রায় গোলাকার, অথচ ধূমকেতুর ভ্রমণবৃত্ত ইলিপ্‌টিকাল বা উপবৃত্তাকার, এই বিশেষ ধরনের ভ্রমণবৃত্তের দরুনই ধূমকেতুরা পাকাপাকিভাবে সৌরজগতের বাসিন্দা হ'তে পারল না। অনেক দিন পরে পরে হঠাৎ এসে উদয় হয়, তারপর আবার দূরে মহাকাশে মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের গড়নও গ্রহদের চেয়ে আলাদা।

কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী বললেন যে ওটা গ্রহাণু ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বস্তুটি মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহাণুপুঞ্জ বলয় থেকে বহু দূরে আছে বলে ওটি যে একটি ছিটকে পড়া গ্রহাণু মাত্র এ মতও বিজ্ঞানী মহলে গ্রাহ্য হ'ল না। অথচ এই উজ্জ্বল বস্তুটির আকার ও আয়তন এতই ছোট যে তাকে গ্রহ বলতেও বাধে, কারণ ওর উজ্জ্বল অংশের ফটো পরীক্ষা ক'রে কমপিউটারের সাহায্যে ঐ বস্তুটির ব্যাস মাত্র ৬৬০ কিলোমিটার ব'লে নির্ধারিত হয়েছে। তবে বস্তুটির অন্ধকার অংশের অদৃশ্য দিকের কথামত হিসেবে ধরলে তার ব্যাস মোটামুটি ৮৮০ কিলোমিটার হবে ব'লেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। তবু বস্তুটির আয়তন সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের আয়তনের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকমের কম।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে বস্তুটির বহিরাবরণ অনেকটা পৃথিবীর চাঁদের মতো। সে ৬০ থেকে ১২০ পার্থিব বছরে একবার করে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। অর্থাৎ তার বার্ষিক গতিও সু-নিয়মিত নয়।

বহু বিতর্কের পর গ্রহ ব'লেই একে মেনে নিয়েছেন সবাই। নাম রাখা হয়েছে ক্ষুদে গ্রহ।

সৌরজগতের সূর্য এবং গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতু সৃষ্টি হবার সময়ে সৃষ্টির সেই আদিমক্ষণে এমনি আরও কিছু মহা-জাগতিক বস্তুকণা ও মেঘপুঞ্জের মালমসল্লা সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবে সৌরজগতের চৌহদ্দির ভেতরেই আটকে পড়ে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। সেইসব মহাজাগতিক বস্তুকণাপূর্ণ মেঘপুঞ্জ হয়তো প্রাকৃতিক নিয়মে, পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছে! কে জানে?

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

সকলেই বিস্ফারিত চোখে এ কথা বললেন।

রাজা সত্যজিৎ তো সবই আগে থেকে জানতেন।

মন্ত্রী সুবুদ্ধি বললেন, অনেকদিন ধরেই অনুদত্ত আর চারুদত্তের উৎকোচ গ্রহণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে শাস্তি দেওয়া যায় নি। আজ আমিই প্রমাণ।

অনুদত্ত আর চারুদত্তের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল।

রাজা সত্যজিৎ বললেন, দেবদত্ত কিন্তু খোঁজ নিয়ে মন্ত্রীমহাশয় আপনাকে অনুমান করতে ভুল করেনি। কাজে কাজেই দেবদত্তের সততা ও অনুসন্ধিৎসার জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার পাওয়া দরকার।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

সমুদ্র কেন লবণাক্ত

পৃথিবীতে শতকরা একাত্তর ভাগই জল, আবার সেই জলের আটানব্বই ভাগ লবণাক্ত। বাদবাকি যা, তার পৌনে দুভাগ বরফ হয়ে থাকে, অবশিষ্ট অতি সামান্য অংশই স্বাদু ও পানীয়। মজার কথা, এই বিশাল লবণাক্ত জলের ভাণ্ডার মানুষের পানীয় হিসাবে কাজে না লাগলেও তার ভিতরেই সন্ধান পাওয়া গেছে প্রায় দুলক্ষ উদ্ভিদ ও জীবের প্রজাতির; কত যে তার বৈচিত্র্য।

সমুদ্রতলের মাঝামাঝি পঁয়ষট্টি হাজার কিলোমিটার ব্যাপী যে ফাটল, তা থেকে মাথা তুলেছে সমুদ্র গর্ভস্থ পর্বতমালা। এদেরই ভিতর থেকে 'ব্যাসাল্ট' নামে সজীব, কৃষ্ণবর্ণের আগ্নেয়-শিলা বেরিয়ে আসে। ব্যাসাল্টের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জল থাকে। এই জলে ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, কার্বন, বোরোন, নাইট্রোজেন ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য ও ভারী ওজনের অনেক ধাতু থাকে। সমুদ্র উপকূলের আগ্নেয়-গিরি থেকে নিঃসৃত লাভা স্রোতের সঙ্গেও লবণ জল বেরিয়ে আসে। এই জলে আয়নিত হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পরমাণু থাকায় সমুদ্র-জলের তুলনায় অধিকতর অম্ল-প্রকৃতির হয়ে থাকে। সমুদ্র জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু সোডিয়াম পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে সৃষ্টি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড নামে যৌগের। প্রকৃতপক্ষে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ শতকরা নব্বই ভাগ হওয়ার কারণেই সমুদ্রের জল এত লবণাক্ত।

পরিবেশ ও আমাদের সমাজ

গত ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল আয়োজিত 'পরিবেশ ও আমাদের সমাজ' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র ও পরিবেশ দূষণ কিভাবে রোধ করা যায় তার ওপর একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। পরিবেশ মন্ত্রী ভবানী মুখোপাধ্যায় সর্বস্তরে পরিবেশ বিজ্ঞানকে অবশ্য পাঠ্য করার জন্যে আহ্বান জানান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভাইস্ চেয়ারম্যান ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের নিজ নিজ এলাকার পরিবেশ দূষণ রোধ করতে বলেন। দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী বলেন, সারা বছর ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। কিন্তু অর্থাভাবে বহু কাজ করতে পারছি না। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুনীত রায় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচেতন হতে অনুরোধ করেন।

এই আলোচনাচক্রে পরিবেশ বিজ্ঞানী ডঃ বি. ডি. নাগ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ডঃ শান্তিময় নিয়োগী, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী ও শ্রী এস. কে. ব্যানার্জী কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন প্রকারের দূষণের ফলে আজকের কলকাতাবাসী কতটা বিপর্যস্ত তা তাঁরা বিভিন্ন ধরনের স্লাইড সহযোগে বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রদর্শনীটির পরিচালনা করেন শ্রীঅমল দাস ও শ্রীসুজিত নাহা।

বিশ্বের সব থেকে ছোট জীবিত বস্তু কি 'প্রায়ণ'

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ১৯৪০ সালে আবিষ্কৃত হওয়ার পর, আমরা তখনই প্রথম বিশ্বে ভাইরাসের অস্তিত্ব টের পেলাম। ভাইরাসের চওড়া হল এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এতদিন ভাইরাসকে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট জীবিত বস্তু হিসেবে জেনেছিলাম। বর্তমানে সানফ্রান্সিসকোয় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্ট্যানলি বি. প্রুসিনার 'প্রায়ণ' নামে এক ধরনের জীবিত বস্তু আবিষ্কার করেছেন। এর আয়তন ভাইরাসের থেকেও একশো থেকে ১০০০ গুণ ছোট। এত ছোট জীবিত প্রাণী যে হতে পারে, তা আমাদের ধারণা ছিল না। প্রুসিনার মনে করেন এই প্রায়ণের জন্যে মানুষের দেহে স্ক্লেরোসিস, পার্কিনসন্স প্রভৃতি জাতীয় রোগের উৎপত্তি। প্রায়ণের দেহে কোনো নিউক্লিক অ্যাসিড নেই। কিন্তু এরা বংশবৃদ্ধিও করছে আবার আশ্রয়দাতা প্রাণীকে আক্রমণও করছে। ভাইরাসের মধ্যেও একটা নিউক্লিক অ্যাসিড আছে। ধারণা করা হচ্ছে প্রায়ণ দুটি বা তিনটি প্রোটিন পরমাণু দিয়ে তৈরি। বংশবৃদ্ধির সময় আশ্রয়দাতা প্রাণীর শরীরের নিউক্লিক অ্যাসিড গ্রহণ করে। যদিও এখনো অবধি প্রায়ণ সম্পর্কিত যথেষ্ট তথ্য আমরা পাই নি, তবুও অধ্যাপক প্রুসিনারের এই নতুন ধরনের গবেষণায় একটু অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

আবিষ্কারের কাহিনী : ছাতা

প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

বর্তমান যুগে ছাতা ছাড়া মানুষের জীবনযাত্রা যদি অচল বল, সেও আশা করি অত্যুক্তি হবে না ; কারণ গ্রীষ্ম আর বর্ষাকালে এই জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করে থাকি। বিশেষ করে শহর আর গ্রামবাংলার নর-নারীরা গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যকিরণের হাত থেকে আর বর্ষাকালে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এই বস্তুটিকে ব্যবহার করে থাকে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে বাড়ি থেকে বের হবার সময় এই বস্তুটির কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়, অনেক সময় এটিকে সঙ্গে নিয়ে না বেরুলে মাঝ রাস্তায় হঠাৎ ঝম্‌ঝম্‌ বা টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি শুরু হলে এই বস্তুটি সঙ্গে না থাকলে আফ্‌শোষের সীমা থাকে না। শুধু বর্ষা-কালেই বা কেন, গরমের দিনেও রোদ্দুরের হাত থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়ায় !

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে, পৃথিবীতে এই বস্তুটির অর্থাৎ ছাতার পরিকল্পনা কার মাথায় প্রথমে এসেছিল এবং কী ভাবেই বা এটি বর্তমানে মানুষের নিত্যব্যবহার্য বস্তুতে পরিণত হলো ? উত্তরে বলতে বাধা নেই যে, এ সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় না। তবে ছাতা আবিষ্কারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, মহাভারতে এই বস্তুটির উল্লেখ আছে এবং এই বস্তুটিকে আবিষ্কার করা সম্বন্ধেও একটি মজার গল্পের উল্লেখ আছে। সেই গল্পটিকে আগে বলে নেওয়াই ভালো।

মহাভারতে আছে, একদিন ভর দুপুর-বেলা জামদগ্নি মুনি হঠাৎ তাঁর খেয়াল বশে তাঁর অস্ত্রগুলিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর নিক্ষিপ্ত তীরগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে আসার জন্যে তাঁর স্ত্রী রেণুকাকে আদেশ করলেন। রেণুকা কী আর করেন। বাধ্য হয়ে স্বামীর আদেশ পালন করতে লাগলেন। তিনি স্বামীর নিক্ষিপ্ত তীরগুলি কুড়িয়ে এনে এনে তাঁর হাতে তুলে দিতে লাগলেন। এদিকে দেখতে দেখতে বেলা বেশ বেড়ে উঠলো, শেষে রেণুকা তীরগুলি কুড়িয়ে আনতে গিয়ে প্রখর সূর্যের তেজে ক্লান্ত হয়ে কিছু-ক্ষণ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে নিয়ে বেশ একটু দেরি করেই মুনির কাছে হাজির হলেন। তাঁর হাজির হতে দেরি হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে রেণুকা তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। বললেন, সূর্যের প্রখর তাপে তাঁর মাথা আর পা দুটো পুড়ে যাচ্ছিল বলেই তিনি কিছুক্ষণের জন্যে ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে-ছিলেন, পরে সুস্থ হলেই তাঁর কাছে হাজির হয়েছেন, আর এ-কারণেই তাঁর আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

কথাটা মুনির কানে যেতেই তিনি সূর্যের উপরে ভীষণ রেগে গেলেন। রেগে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কী, সূর্যের এতো-বড়ো আস্পর্ধা ! কিন্তু একটু পরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সূর্য যদি উত্তাপ না দেয় তাহলে সূর্যকিরণের অভাবে

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই বিনষ্ট হবে! তাই তিনি ক্রোধ সম্বরণ করে রেণুকার মাথা আর পায়ের কষ্ট দূর করার জন্যে ছাতা আর পাদুকার ব্যবস্থা করলেন। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জামদগ্নির উদ্ভাবিত আচ্ছাদনই পরবর্তী কালে 'ছাতা' আর 'জুতো' নামে পরিচিত হয়েছিল। অবশ্য সেই পৌরাণিক যুগের জামদগ্নি মুনির পরিকল্পিত ছাতা আর পাদুকার সঙ্গে বর্তমান যুগের ছাতা আর জুতোর কোন নিবিড় সম্পর্ক আছে কী না তা আমার জানা নেই। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এশীয় দেশগুলিতে প্রথম ছাতার প্রচলন হয়েছিল। এর কারণ হল, এই দেশগুলির জলবায়ু। এই দেশগুলিতেই রোদ আর বৃষ্টির আধিক্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় যে বেশি সে কথা যে কোন শিক্ষিত লোক মাত্রেই জানেন।

অনেকের মতে, প্রাচীন চীন দেশেই নাকি ছাতার আদি জন্মস্থান। আগে কাম্বোডিয়ার লোকেরা নাকি ছায়া পাবার আশায় তালপাতা ব্যবহার করতো; কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির সময়ে তো আর তালপাতা নিয়ে চলাফেরা করা যায় না তাই তারা বেশ অসুবিধাই বোধ করতো। বিশেষ করে গোরু চরাবার সময় রাখালেরা একহাতে গোরুর দড়ি, আর অন্য হাতে তালপাতা ধরে রেখে কাজ চালাতো; কিন্তু কোন কারণে গোরু ভয় পেয়ে ছুটতে থাকলেই তখন রাখালকে ঐ গোরু সামলাবার জন্যে তালপাতা ফেলে দিয়ে ছুটতে হতো। এর পর থেকেই নাকি চীন দেশে ছাতার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করার মতো যে, আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপে ছাতার ওপরকার ঢাকনি কাগজ দিয়ে তৈরি করা হতো, পরে কাগজের স্থান অধিকার করে সিল্ক বা আলপাকা জাতীয় কাপড়। ঐ সময়ে ছাতার শিকগুলো তৈরি করা হতো হাল্‌কা বাঁশের কাঠি দিয়ে। এর পরে হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছাতার গঠনপ্রণালীও পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হল, আর কালে কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও ছাতার প্রচলন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ইংরেজি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে ছাতার প্রচলন হয়। জোনাস্ হ্যান্সওয়ে নামে একজন পর্যটক ছাতাকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রধান অবলম্বন হিসেবে ঐ দেশে ছাতার প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন। যার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই বস্তুটির প্রচলন ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইংরেজরা ছাতা উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছাতা কুলীন বস্তুতে পরিণত হয়। তবে এ-কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ইংল্যাণ্ডে প্রথমে নারীরাই এই বস্তুটির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে ব্যবহার করতে থাকেন; অবশ্য রানী অ্যানের রাজত্বকাল থেকেই ইংল্যাণ্ডে নারী এবং পুরুষ উভয়েই ছাতা ব্যবহার করতে থাকেন এবং এই বস্তুটির ব্যাপক প্রচলনও হয়।

ইতিহাস বলে, আগে শ্যাম, গ্রীস আর প্রাচীন মিশরে এই বস্তুটিকে কেবলমাত্র মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রোমে স্ত্রীলোক আর বিলাসী পুরুষেরাই কেবলমাত্র এই বস্তুটির ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রাচীন মিশরের কিছু ক্রীতদাস তাদের

মনিবদের মাথার ওপরে 'ছত্র' বস্তুটিকে ধরে রাখার জন্যে নিযুক্ত হতো।

এখন ছাতা বহু রকমের দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ছায়াদানের জন্যে তৈরি মেয়েদের ব্যবহার করার মতো ছোট ছাতাকে বলা হতো 'প্যারাসোল' (Parasol)। আবার এমন ছাতাও দেখতে পাওয়া যায় সেগুলিকে যখন ব্যবহারের প্রয়োজন তখন ছাড়া ইচ্ছে করলেই ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেওয়া যায়। আবার এমন ছাতাও আছে সেগুলিকে ভাঁজ করে ছাতার বাঁটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেই সেটি লাঠি বা ছড়ির মতো কাজ করে। আজকাল আমাদের দেশের মেয়ে এবং পুরুষেরা বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন অফিসে কাজ করে থাকেন তাঁরা ফোল্ডিং ছাতা ব্যবহার করে খুশী হন, কারণ এগুলো যখন প্রয়োজন হয় না তখন তাঁরা নির্বিবাদে ছাতাটিকে ফোল্ড বা ভাঁজ করে ছোট্ট করে নিজেদের ব্যাগের ভেতরে রেখে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারেন ট্রামে বা বাসে! এখন এই ধরনের ছাতায় বাজার ছেয়ে গেছে।

ছাতা যে আজ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মাথাকে রোদ আর বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করছে তা আর ইনিয়েবিনিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ছাতা আবিষ্কারের কাহিনীকে কেন্দ্র করে এ-কথা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, মানুষ যখনই কোন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই তার মনে নতুন উদ্ভাবনীশক্তি জাগ্রত হয়; আর এই ভাবেই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারের সকল বাধাকে অতিক্রম করে পৃথিবীকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রগতির পথে। এই ভাবেই পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন যাত্রা ক্রমে সহজ থেকে সহজতর হয়ে ওঠে!

দুষ্টু নুটুন

রাখাল বিশ্বাস

সারাটি দিন দুষ্টুমি তোর
সকাল থেকে সন্ধে,
মা ডেকে কয় দুস্টু নুটুন
এবার পড়ায় মন দে,
ছুটির পড়া অঙ্ক কষা,
ব্যাকরণের সন্ধি—
শূন্য পেলেই গাধার টুপি
ছাড় বাজে সব ফন্দি।
চড়ুইভাতি, নাগরদোলা,
রোদভরা মুখ পার্কে—
কয়লা কাঠে আগুন জ্বালে
বলতে পারিস্ আর কে ?
আঁধার রাতে বাড়ির ছাদে
লুকিয়ে থাকিস্ তোর কি ?
কাটাস্ কেন একলা একা
তাড়াস্ রাতের চোর কি !
ভেতর থেকে নাচায় তোকে
কার কছে তুই যাস্ রে—
তার ছবিটা আঁকরো এবার
লিখব ইতিহাস রে ॥

পার্থসারথির ধারাবাহিক উপন্যাস

দুরন্ত দুংরাজ

[আগে যা ঘটেছে: দুংরাজ হাতির পিঠে থেকে নেমে ধোঁয়ার জায়গা লক্ষ্য করে। তার সঙ্গে চলল আপ্পা। কিন্তু সে পড়ল বুনো মোষের পাল্লায়। মোষের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়লাভ করে ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহে সে ধোঁয়ার উৎসস্থল আগুনের কাছে উপস্থিত হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে পড়ল দস্যুদের কবলে। আপ্পা তার আগেই দলছাড়া হয়ে পড়েছে।]

॥ ৭ ॥

দুংরাজ নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করতে লাগল। তার নির্ভরযোগ্য সাথী হাতি নেই, আপ্পাও নেই। তার উপর দস্যুদের হাতে সে বন্দী।

দস্যুরা তাকে ধরে নিয়ে গেল একটি গভীর জঙ্গলের ভিতর। সেই জঙ্গলের মধ্যে যে ঘরবাড়ি আছে তা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। তারই একটি ঘরে আটক করে রাখা হল দুংরাজকে। দু'হাত তার বেঁধে ফেলা হল শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে। একটি বড় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

দুংরাজ দেখতে পেল সেই ঘরে তারই মত অসহায় আরও তিনজন লোক রয়েছে। তাদেরও হাত পা ও শরীর ভিন্ন ভিন্ন খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। সে ভেবেছিল এখানে সেই হতভাগ্য দু'জনকে দেখতে পাবে—যাদের সে ডাকাতদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল। তার ধারণা আবার তারা ডাকাতদের হাতেই পড়েছে। কিন্তু এখানে সে তাদের দেখতে পেল না।

ঘরগুলি ঠিক সাধারণ গৃহস্থদের ঘরের মত নয়। বেড়া আছে, দরজা আছে, কিন্তু উপরের দিকে কোন চালা নেই। ঘন জঙ্গলের বিরাট বিরাট গাছগুলিই শাখা বিস্তার করে উপরের দিকটা ঢেকে রেখেছে।

দুংরাজ বুঝতে পারল না এমন ভাবে

তাকে বন্দী করে রাখা হল কেন? কি উদ্দেশ্য ডাকাতদের? তার কাছে তো কোন ধনরত্ন নেই। তবে!

দুংরাজ দেখে ঘরের অন্যান্য বন্দীরা একটু অবাক হয়ে গেল। বিশেষ করে তার বেশভূষা ও হাবভাব তাদের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হল।

প্রথম প্রথম বেশ কিছুক্ষণ তারা দুংরাজের সঙ্গে কথা বলতে সাহস করল না। অথচ দুংরাজ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলও ভয়ানক। এই অদ্ভুত লোকটি কি ভাষায় কথা বলবে তাও তাদের জানা নেই।

অনেকক্ষণ পর দুংরাজ তাদের জিজ্ঞেস করল—তোমাদের কেন এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে?

ঐ লোক তিনজন অবাক হয়ে গেল দুংরাজের কথা শুনে। একি, লোকটা যে তাদের ভাষাতেই কথা বলছে। তখন তারা সব ঘটনাই দুংরাজকে খুলে বলল। বলল—আমরা পথ ঘাট মেরামত করতাম। এক কনট্রাকটার কোম্পানীর লোক আমরা। রাস্তার ধারে তাঁবু ফেলে আমরা থাকতাম। একদিন রাত্রিবেলা মুখ বেঁধে ডাকাতের লোকেরা আমাদের তুলে নিয়ে এসেছে।

দুংরাজ অবাক হয়ে গেল তাদের কথা শুনে। জিজ্ঞেস করল—তোমাদের ধরে এনে ডাকাতদের লাভ?

লোক তিনটি বলল—আমাদের কাছ থেকে ডাকাতরা কথা বের করতে চায়। আমাদের দলে আছে প্রায় একশ' লোক। কবে আমাদের মাইনে দেওয়া হয়, কোন্ দিন কি ভাবে মাইনের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসে সেই সব খবর ডাকাতরা আমাদের কাছ থেকে শুনতে চায়।

—তোমরা বলেছ?

—হ্যাঁ, বলেছি। না বললে আমাদের মেরে পুড়িয়ে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছে। কাজেই না বলে উপায় কি?

দুংরাজ জিজ্ঞেস করল তা'হলে তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?

লোকগুলি বলল—মাসের পাঁচ তারিখে আমাদের মাইনে হয়। আগের দিন কোম্পানীর কর্তারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলেন। অনেক দূরের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে হয়, তাই আগের দিনই তুলে রাখেন কর্তারা। পরের দিন ভোরবেলা আমাদের মাইনে দেওয়া হয়। রাত্রিবেলা কর্তাদের কাছেই টাকা মজুত থাকে। অনেক টাকা। চার তারিখ পর্যন্ত আমাদের এখানে আটক থাকতে হবে। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমাদের সঙ্গে নিয়ে ডাকাতরা যাবে। সেই টাকা লুট করবে ডাকাতরা। তারপর আমাদের ছেড়ে দেবে।

দুংরাজ জিজ্ঞেস করল—চার তারিখে তোমাদের নিয়ে ডাকাতরা যাবে?

ওরা জবাব দিল, হ্যাঁ।

দুংরাজ দিন তারিখের হিসাব বোঝে না। তাই জিজ্ঞেস করল—সেই তারিখ আসতে কতদিন বাকি?

লোকগুলি জবাব দিল, আমরা এখানে আটক থাকার পর তারিখের হিসাব গুলিয়ে ফেলেছি। তবে ডাকাতরা ঠিক হিসাব রাখে। ওরা নিশ্চয়ই যাবার সময় আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে।

দুংরাজ জিজ্ঞেস করল—তোমাদের মত এমন হতভাগ্য আর এখানে ক'জন আছে?

লোক তিনটি বলল—অন্য ঘরে হয়তো আছে। এখান থেকে বুঝতে পারছি না। আমাদের ঘরে আরও দু'জন ছিল, কাল তাদের এখান থেকে খুলে নিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।

দুংরাজ জিজ্ঞেস করল—কেন ওদের পুড়িয়ে মারল।

লোকগুলি বলল—ডাকাতদের কাজই এই। ওরা চেষ্টা করে আটক করা লোকের মুখ থেকে গোপন খবর আদায় করবে। না পারলে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু তোমাকে ওরা বেঁধে নিয়ে এল কেন? তোমার কাছ থেকে কি কোন গোপন খবর আদায় করবে?

দুংরাজ বলল—আমাকে ওরা বন্দী করে রেখেছে আক্রোশে। ওদের কবল থেকে কয়েকদিন আগে দু'জন লোককে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমার ওপর ওদের আক্রোশ।

—তা হলে তুমি কি করবে।

—এখান থেকে পালাব।

—কেমন করে।

—দেখি কোন ফন্দি বের করা যায় কিনা।

—কি করে বের করবে? তোমার হাত পা যে বাঁধা।

দুংরাজ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল—চেষ্টা করলে সব কিছুই করা যায়। সবাই মিলে চেষ্টা করলে হবে না কেন? তোমরা আমাকে সাহায্য করবে তো? অবশ্য সবাই আমরা একসঙ্গে পালাব।

লোক তিনটি কোন কথার জবাব দিল না। তারা হতভম্ব। কারণ তারা জানে নির্দিষ্ট দিনে তাদের মুক্তি হবে। কাজেই বেশি দুঃসাহস করে লাভ কি? তা ছাড়া পালাতে গিয়ে যদি তারা ধরা পড়ে।

লোক তিনটি কিছুক্ষণ ভেবে বলল—তুমি চিন্তা করো। যদি কোন মতলব মাথায় আসে তবে আমাদের বলো, আমরা ভেবে দেখব।

রাত হয়ে গেল। রাত্রিবেলা মশাল জ্বালিয়ে এল কয়েকজন ডাকাত। তাদের হাতে নানারকম খাবার জিনিস। সেই খাবার জিনিস ভাগ করে চারজনকে দিল। পানীয় জলও তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

চলে যাবার আগে ডাকাতরা লোক তিনটিকে বলল—কাল চার তারিখ। কাল রাত্রে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে তোমাদের কোম্পানীর আস্তানায়। টাঁকাগুলি কাল রাতের মধ্যেই নিয়ে আসা চাই। যদি তোমরা বেইমানি করো তা হলে তোমাদের মুণ্ডু কেটে ফেলা হবে।

ডাকাতরা প্রত্যেকের হাত খুলে দিয়েছিল যাতে তারা খেতে পারে। খাওয়া শেষ হলে আবার তারা সবাইকে বেঁধে রেখে চলে গেল।

দুংরাজ বলল—কাল তোমাদের মুক্তি হবে, ভালই হল। তোমাদের দুঃখের অবসান হবে। কিন্তু আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে কি?

—কি সাহায্য?

—আজ রাত্রেই আমি এখান থেকে পালাতে চাই। এমন ভাবে তোমাদের কোম্পানীর এতগুলি টাকা ডাকাত নিয়ে যাবে তা আমি চাই না। তোমাদের সেই জায়গায় যাবার হদিস একটু দিতে পার।

লোকগুলি বলল—জঙ্গলের বাইরে যে পাকা রাস্তাটি আছে, সেটা দিয়ে পুবদিকে গেলে যে পুলটা পড়বে, সেই পুলের কাছেই আছে কয়েকটা তাঁবু। সেখানেই কর্তারা থাকেন। আমাদের কোন উপায় নেই তাই আমরা এই কাজ করতে যাচ্ছি। কিন্তু ছাড়া পেলেও কোম্পানীর বাবুরা

(৩৩ পৃষ্ঠায় দেখ

পুরাণের গল্প

—অর্জুন দে

পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন।

আগেকার দিনের অনেক রাজার মত তাঁরও মৃগয়ার সখ ছিল। একদিন মৃগয়ার বেরিয়ে তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

দূরে থেকে একটি হরিণকে দেখতে পেয়ে তিনি বান ছুড়লেন। বানটি হরিণের পিঠে বিদ্ধ হল। হরিণ আর্তনাদ করতে করতে ছুটে পালাল।

রাজা পরীক্ষিৎ হরিণকে ধরবার জন্য তার পেছন পেছন ছুটলেন।

কিন্তু হরিণকে দেখতে পেলেন না। সে যে ছুটে কোন্ দিকে পালাল তাও ঠিকমত ঠাহর করতে পারলেন না।

রাজা এদিকে ওদিকে হরিণকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে একটা আশ্রম তাঁর চোখে পড়ল।

রাজা পরীক্ষিৎ শুনেছিলেন যে শমীক মুনি এই বনের এক আশ্রমে বাস করেন। কি মনে করে তিনি আশ্রমের ভিতরে ঢুকলেন। দেখলেন, শমীক মুনি চোখ বুজে ধ্যানে বসে আছেন।

রাজা তাঁকে বললেন, "মুনিবর, আপনি কি এদিকে বানবিদ্ধ কোন হরিণকে আসতে দেখেছেন?"

শমীক মুনি রাজার কথার কোন উত্তর দিলেন না।

উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তখন তিনি মৌনব্রত পালন করছিলেন।

মৌনব্রত পালন করার কালে কথা বললে ব্রত ভঙ্গ হয়।

রাজা পরীক্ষিৎ মুনির কাছে কোন জবাব না পেয়ে রেগে গেলেন। তিনি ভাবলেন, মুনির খুব অহঙ্কার হয়েছে তাই দেশের রাজাকে অবজ্ঞা করছেন। সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত দিচ্ছেন না।

মুনি হোক আর যাই হোক, রাজাকে অমান্য করার সাহস ভাল নয়। কিছু শাস্তি দেওয়া উচিত।

রাজা পরীক্ষিৎ দেখতে পেলেন মাটির উপর একটা মরা সাপ পড়ে আছে। তিনি সেই সাপটা ধনুর আগা দিয়ে তুলে শমীক মুনির গলায় জড়িয়ে দিলেন। তারপর ফিরে চলে গেলেন।

শমীক মুনির এক ছেলে ছিল। সে তার বাবাকে খুব ভক্তি করত। সে যখন জানতে পারল যে তার বাবার গলায় রাজা পরীক্ষিৎ মরা সাপ জড়িয়ে রেখে গেছেন তখন তার খুব রাগ হল। সে ভাবল রাজা তার বাবাকে অপমান করেছ। এই অপমান সহ্য করা ঠিক নয়। রাগের বশে শমীক মুনির ছেলে অভিশাপ দিল—"যে আমার বাবার গলায় মরা সাপ ঝুলিয়েছে তাকে সাত দিনের মধ্যে তক্ষক নাগ ছোবল দিয়ে মেরে ফেলবে।"

সে কথা শুনে শমীক মুনি বললেন, "এ তুমি কি করলে! রাজা জানতেন না

যে আমি মৌনব্রতী ছিলাম তাই তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে রেগে গিয়ে আমার গলায় সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি না জেনে অপরাধ করেছেন। এর জন্য তাকে অভিশাপ দেওয়া ঠিক হল না।”

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শমীক মুনির ছেলে বলল। “রাগের বশে শাপ দিয়ে ফেলেছি কিন্তু এখন আর উপায় নেই। শাপ মিথ্যে হবার নয়। রাজাকে মরতে হবেই। তক্ষকের দংশনে সে জ্বলে পুড়ে মরবে।”

শমীক মুনির রাজার উপর দয়া হল। কিন্তু কিছু করবার নেই। তাঁর ছেলের শাপ মিথ্যে হয় না। তিনি রাজা পরীক্ষিতের কাছে সব খবর জানাবার জন্য তাঁর এক শিষ্যকে পাঠালেন। শিষ্য রাজাকে সব কথা জানিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে বললেন। রাজা তক্ষক নাগের ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন।

তিনি এক প্রকান্ড স্তম্ভ নির্মাণ করালেন। সেই স্তম্ভের উপরে প্রাসাদ তৈরি করে তার মধ্যে বাস করতে লাগলেন। নাগের দংশনের বিষের ওষুধ যারা জানেন সেই সব চিকিৎসকদের ডেকে পাঠালেন। বিষের প্রতিক্রিয়া যারা মন্ত্র পড়ে নষ্ট করে দিতে পারেন সেই সব ব্রাহ্মণদেরও খবর দিলেন।

তারপর মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং বিষ-চিকিৎসকদের নিয়ে প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন।

সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে রাজার মৃত্যু হবার কথা। রাজা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একদিন যায়, দু দিন যায়, কোথায় তক্ষক, কোথায় কি, রাজার কিছুই হল না।

এমনি করে ছ দিন কেটে গেল। রাজা ভাবলেন তিনি মিছিমিছি ভয় পেয়েছেন নইলে এতদিনে তক্ষক এসে তাঁকে ছোবল দিয়ে মেরে ফেলত।

সাত দিনের দিন কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে তিনি প্রাসাদের মধ্যে নিজের ঘরে বসে ছিলেন।

এমন সময় মন্ত্রী এসে খবর দিল যে কয়েকজন তপস্বী রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু রাজার অনুমতি না থাকায় প্রহরীরা তাদের প্রাসাদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

সে যুগে তপস্বীদের খুব সম্মান ছিল।

রাজা ভাবলেন তপস্বীরা যখন নিজেরা তাঁকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন তখন তাঁদের প্রাসাদের দরজা থেকে ফিরে চলে যেতে বলা উচিত হবে না। তপস্বীরা নিরীহ প্রাণী, কোন ক্ষতি করার মতলবে নিশ্চয়ই আসেন নি।

রাজা তপস্বীদের ডেকে পাঠালেন।

তাঁদের অনেক উপহার দিলেন।

তপস্বীরা সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে একটি ফল দান করলেন। তাঁরা বললেন ফলটি রাজা যদি খান তবে জীবনে তাঁকে কোন দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে না।

তপস্বীরা চলে যাবার পর রাজা সেই ফলটি খাবার জন্য ভেঙ্গে মুখে দিতে যাবেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল ফলের মধ্যে একটা তামার রঙের কীট রয়েছে।

পাকা ফলের মধ্যে তামাটে কীট দেখে রাজা বিরক্ত হলেন। তিনি কীটটি ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেই কীট স্বরূপ ধারণ করল।

তক্ষকই কীটের ছদ্মবেশে ফলের মধ্যে ছিল। সে-ই কয়েকজন নাগকে তপস্বীর রূপ ধারণ করে রাজার কাছে যেতে আদেশ দিয়েছিল।

রাজা কীটকে ধরতেই তক্ষক নিজের মূর্তি ধরে গর্জন করতে করতে রাজাকে জড়িয়ে ধরে ছোবল মারতে উদ্যত হল।

রাজা বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি

তুমিই তক্ষক। আমাকে মারবার জন্য এসেছ। কিন্তু আমি তোমাকে দোষ দিই না। এভাবে মরণ হওয়াই আমার নিয়তি। ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। আমি ষাট বছর রাজত্ব করেছি। আজ আমি হাসিমুখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেব।"

তক্ষক রাজাকে দংশন করে আকাশে উড়ে চলে গেল।

মেঝেতে রাজার দেহ লুটিয়ে পড়ল।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃত্যুর সময় তক্ষকের উপর কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন নি কিন্তু তাঁর ছেলে জনমেজয় যখন জানতে পারলেন যে তক্ষকের দংশনে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে তখন তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তক্ষককে যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়ে মারবার উদ্দেশ্যে সর্পসত্রের ব্যবস্থা করলেন। বড় বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ করে তক্ষককে ধ্বংস করার জন্য ডেকে পাঠালেন।

ব্রাহ্মণেরা কালো কাপড় পরে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞে ঘৃতাহুতি পড়তেই আগুনের শিখায় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মন্ত্র পড়ে ব্রাহ্মণেরা সর্পকুলের ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হলেন।

যজ্ঞ চলতে লাগল আর হাজারে হাজারে নানা রঙের সাপ এসে যজ্ঞের আগুনে লাফিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

আগুনের শিখা তাদের স্পর্শ করা মাত্র তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তক্ষক সেই যজ্ঞের কথা জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ছুটল। তাঁকে বলল, "আমাকে রক্ষা করুন। জনমেজয় আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য

যজ্ঞ করছে। আমি তার বাবাকে ছোবল দিয়ে মেরে ফেলেছিলাম। জনমেজয় প্রতিশোধ নিতে চাইছে।”

ইন্দ্র বললেন, “পরীক্ষিৎ তো খারাপ লোক ছিল না। তাকে তুমি ছোবল মারতে গিয়েছিলে কেন?”

তক্ষক বলল, “আমার কোন দোষ ছিল না। শমীক মুনির ছেলের শাপ যাতে বিফল না হয় সে জন্যই আমাকে ছোবল মারতে হয়েছিল। সবই নিয়তির বিধান।”

ইন্দ্র বললেন, “তোমার কোন ভয় নেই। আমার কাছে লুকিয়ে থাক।”

তক্ষক নিশ্চিন্ত হয়ে ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিল।

এদিকে নাগরাজ বাসুকি সর্পকুল ধ্বংস হচ্ছে দেখে তার বোন দেবী মনসার কাছে গেল। মনসা তাঁর ছেলে আস্তীককে নাগকুল রক্ষার জন্য পাঠালেন।

জনমেজয়ের যজ্ঞ তখনও চলছে। অনেক সাপ পুড়ে মরছে কিন্তু তক্ষক আসছে না দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

যজ্ঞের হোতারা জানতে পারলেন যে তক্ষক ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবার জন্য ইন্দ্রকে আহবান করলেন।

নিজের উত্তরীয়ের মধ্যে তক্ষককে লুকিয়ে রেখে ইন্দ্র উপস্থিত হলেন।

ইন্দ্র তক্ষককে লুকোবার চেষ্টা করলেও জনমেজয় তাঁর চালাকি বুঝতে পারলেন। তিনি পুরোহিতদের আদেশ করলেন ইন্দ্রকে যজ্ঞের আগুনে ছুড়ে ফেলা হোক।

সে কথা শুনে ইন্দ্র উত্তরীয় থেকে তক্ষককে বের করে দিয়ে নিজে পালিয়ে গেলেন।

তক্ষক মন্ত্র বলে আকৃষ্ট হয়ে যজ্ঞের আগুনের দিকে এগোতে লাগল।

ঠিক সেই সময়েই মা মনসার পুত্র আস্তীক মুনি যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করলেন।

তিনি আগে আসতে পারেন নি। রাজা জনমেজয়ের আদেশে বাইরের লোককে প্রহরীরা যজ্ঞস্থলে আসতে দিচ্ছিল না।

ভিতরে আসতে না পেরে আস্তীক মুনি দরজায় দাঁড়িয়ে জনমেজয়ের স্তুতি আরম্ভ করলেন। সেই স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে জনমেজয় আস্তীক মুনিকে যজ্ঞস্থলে আসার অনুমতি দেন এবং তাঁকে বর দিতে চান।

রাজা জনমেজয় বর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র আস্তীক মুনি তক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আগুনের দিকে আর এগিয়ো না। থাম।”

এবং রাজাকে বললেন, “আপনি আমায় বর দিতে ইচ্ছুক জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। এই বর দিন, যে যজ্ঞ হচ্ছে তা এখনই বন্ধ হয়ে যাক।”

জনমেজয় বললেন, “আপনি অন্য বর চান। আমি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ করছি।”

আস্তীক মুনি বললেন, “মহারাজ, কথা দিয়ে কথা না রাখা আপনার মত মহান ব্যক্তির শোভা পায় না। আমি অন্য কোন বর চাইব না। যদি ইচ্ছা হয় এই যজ্ঞ বন্ধ হবার বর দিন, অন্য কিছু আমার কাম্য নয়।”

জনমেজয় আর কি করবেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি যজ্ঞ বন্ধ করার আদেশ দিলেন। যজ্ঞ বন্ধ হল।

তক্ষককে আর আগুনে পুড়ে মরতে হল না। সর্পকুল রক্ষা পেল।

বুদ্ধি বড়

নির্মল বিশ্বাস

একবার তিনজন শিকারী একসঙ্গে শিকারে বেরিয়ে এক জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। শিকারীদের মধ্যে দু'জন খুব পয়সাওলা বড়লোক—মোটাসোটা চেহারা তাদের। অন্যজন রোগা-পাতলা, গরীব মানুষ সে। সারাদিন বৃথাই শিকারের সন্ধানে ঘুরে মরল তারা। দিনের শেষে যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, শুধু তখনই তারা তিনজনে মিলে কোনরকমে একটা বড়-সড় বনমোরগ শিকার করল।

তিনজনেই দারুণ ক্লান্ত, ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। তাঁবুতে ফিরে এসে আগুন জ্বালানোর পর, মহা ভাবনায় পড়ে গেল তারা। বনমোরগ তো মোটে একটা, তিনজনের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়; তাহলে নিজেদের মধ্যে কিভাবে ভাগ করবে সেটা? কিছুতেই ভেবে পায় না যে সমস্যাটার সমাধান করবে কিভাবে!

শেষ পর্যন্ত মোটা লোক দু'জন প্রস্তাব করল, "যে সবচেয়ে বেশিক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে থাকবে, সে-ই ওই মোরগটা পাবে; কি বল?"

"বেশ কথা!" বলল রোগা-পাতলা লোকটি,—"তাই হোক তা'হলে।"

তারপর তিন শিকারী মিলে আগুনটাকে ঘিরে চুপচাপ বসে রইল—যেন কেউ এসে তাদের ঠোঁট সেলাই করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর পরই তারা একে অন্যের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে আর ভাবছে: কে আগে কথা বলে দেখি।

এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কেটে গেল—তিন জনেই একেবারে মুখ বুজে বসে রয়েছে।

তখন রোগা লোকটি নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বনমোরগটার পালক-টালক ছাড়িয়ে ধুয়েটুয়ে, কেটেকুটে সেটাকে হাঁড়িতে চাপিয়ে আগুনের ওপর বসিয়ে দিল। মোটা দু'জন চুপ করে বসে রইল।

তারপর মাংসটা রাঁধা হয়ে যেতেই রোগা-পাতলা লোকটি সেটাকে হাঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে দিল। তখনও চুপ করে রয়েছে মোটা লোক দু'জন। কিন্তু, রোগা লোকটা যখন মুরগিটার শেষ হাড়টি পর্যন্ত চিবিয়ে শেষ

করে ফেললে, তখন আর মোটা লোক দুজন কিছুতেই মুখ বুঁজে থাকতে পারল না। দারুণ রাগে ক্ষেপে গিয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল,—"শর্ত ভেঙ্গে তুমি কোন্ সাহসে মোরগটাকে খেয়ে শেষ করলে ?"

"শর্তটা তোমরাই ভুলে গেছ দেখছি !" মুচ্কি হেসে বলল রোগা লোকটি, "সবচেয়ে বেশিক্ষণ কথা না বলে যে মুখ বুঁজে থাকবে, সে-ই ওই মোরগটাকে খাবে —এইতো শর্ত ছিল ; না-কি ? এখন, আগে কথা বলেছে কে ? তোমরাই তো চেঁচিয়ে মৌনভঙ্গ করেছ ! আমি তো এ পর্যন্ত একটাও কথা বলিনি ! সুতরাং আমিই জিতেছি। তাহলে আর পাখিটাকে রেঁধে খেয়েছি বলে এতো চেঁচাচ্ছ কেন ?

মোটা লোক দু'জন খুব ধোঁকায় পড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাদের মাথা চুলকাল। তারপর বুঝলো : হ্যাঁ, রোগাটা ঠিকই বলেছে। তাদের আর কিছু বলার নেই।

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের চাকরিতে নেবে না। উল্টে হয়তো আমাদের উপর মামলা চালাবে।

দুঃরাজ হঠাৎ আবিষ্কার করল তাকে যে ভাবে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়েছে তা অনেকটা আলগা। ভুলে ঠিক ভাবে বাঁধতে পারেনি। সে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সেটা আরও আলগা করে ফেলল। তারপর খুলে ফেলল সেই বাঁধনটা।

এবার দুঃরাজ খুঁটির বাঁধন থেকে মুক্ত, কিন্তু তখনও সারা গা জড়িয়ে বাঁধন রয়েছে। সেই অবস্থায় কোন রকমে এগিয়ে গেল বন্দী লোক তিনটির কাছে। তারা প্রত্যেকে দাঁতের সাহায্যে কিছু চেষ্টা করে দুঃরাজকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিল।

দুঃরাজ বলল—এবার তোমাদের আমি মুক্ত করে দেব।

কিন্তু হঠাৎ সেই সময়েই বাইরে শোনা গেল ডাকাতদের পায়ের শব্দ। তারা কি কারণে আবার ফিরে এসেছে।

দুঃরাজ বলল—আর সময় নেই বন্ধুরা। আমি চললাম। বিদায়।

খুব আস্তে আস্তে কথাগুলি বলে দুঃরাজ সেই খুঁটির উপর উঠে লাফ দিয়ে একটি গাছের ডাল ধরে ফেলল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

(চলবে)

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না

— শান্তনু ভট্টাচার্য

বাড়ির ছাদে পায়চারি করছিলাম। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্য তখন সারা আকাশে লাল আভা ছড়াতে ছড়াতে দূরের বড় বড় বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে অস্ত যাচ্ছে। ঠিক সে সময় কেউ যেন আমার নাম ধরে রাস্তা থেকে ডাকলো। ছাদ থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিলাম। বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক। বেশ সুন্দর চেহারা। মাথায় কাঁচা পাকা চুলের মধ্যে কিছুটা টাক পড়েছে। চোখে বেশ দামী চশমা। আমাকে দরজা খুলতে দেখে প্রশ্ন করলেন, "এটা কি মণিবাবুর বাড়ি?"

"আমিই মণি গঙ্গোপাধ্যায়। ভেতরে আসুন।"

আমার সঙ্গে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ওনাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বলুন তো? আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

উনি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "আমার নাম তারক চন্দ্র ঘোষ। কোন্নগরে থাকি। ওখানেই ডাক্তারি করি।"

এবার আমার মনে পড়ে গেল, কিছু-দিন আগেই ডাক্তার ঘোষের একশ পাঁচটি ইংরেজি ভাষায় ভক্তিগীতি নিয়ে রচিত 'গীত-সুধা' বইটির কাগজে রিভিউ করে-ছিলাম। ইনিই কি সেই ব্যক্তি। ভদ্র-লোককে প্রশ্নটা করতেই উনি বিনীত কণ্ঠে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কাগজের অফিসে গিয়ে আপনার ঠিকানা জোগাড় করে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এখানে এসেছি। আপনার লেখা সত্যিই খুব ভাল হয়েছিল।"

এরপর আমাদের নানা রকম আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। ভদ্রলোক দেখলাম বেশ ধার্মিক প্রকৃতির। ভগবানে অগাধ বিশ্বাস। এমন কি ধর্মালোচনায় কোন তর্কের শুরুতেই উনি সযত্নে তর্ক

এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "ভগবান নিয়ে তর্ক করে লাভ কি? যে ভাব নিয়ে মানুষ রয়েছে, তাকে তার ভাবেই থাকতে দিন। আসল জিনিস হলো তাঁর প্রতি বিশ্বাস। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে, শুধু মুখে বললেই চলবে না। এমন বিশ্বাস করতে হবে যে বোধে বোধ হওয়া চাই।"

ভদ্রলোক থামতে আমি মৃদু হেসে বললাম, "আপনি দেখছি প্রকৃতই ধার্মিক ব্যক্তি। শুনেছি আপনার সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনে দান করে দিয়ে সেখানেই রয়েছেন।"

ডাক্তার ঘোষ এবার হেসে উঠে বললেন, "ধর্ম কী জিনিস বা ধার্মিক হতে গেলে এইসব করতে হবে। এ'সব আমি জানতেও চাই না। তবে ভগবানের কাছে সব সময় প্রার্থনা করি তিনি আমাকে যে বিশ্বাস দিয়েছেন, সেটুকু যেন ধরে রাখতে পারি। আর সেই বিশ্বাস শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে চিরকাল যেন তাঁকে ভালবাসতে পারি। কারণ বিশ্বাস না থাকলে তো ভালবাসাই আসবে না।"

একটু থেমে ডাক্তার ঘোষ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "এ বিশ্বাস তাঁরই দেওয়া। আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যা আমি ডাক্তারি জ্ঞান খুঁজেও বার করতে পারি নি। সেই ঘটনাটাই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই কাহিনী আপনাকে বলছি শুনুন, সে সময় বেশ জমাটি প্র্যাকটিস করছি। চারিদিকে বেশ নাম ডাকও হয়েছে। কোন্নগরে বিরাট পৈত্রিক বাড়ির একতলার ঘরে নিজের ডাক্তারখানা করে নিয়েছি। সর্বদা রোগীর ভিড় লেগেই আছে। একদিন এক ভদ্রলোক এলেন, মাঝে মধ্যে পেটে ব্যথা হয়। পরীক্ষা করে বুঝলাম ওনার কোলাইটিস রয়েছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ওনার বুকের কাছটা কীরকম উঁচু হয়ে রয়েছে। কারণ জিজ্ঞেস করায় জানালেন, ওখানে অন্য একটা রোগের ওষুধ রয়েছে। স্বভাবতই ডাক্তারি কৌতূহলে অন্য রোগটার কথা জিজ্ঞেস করায় উনি বললেন, "রোগটা সর্দি—এ্যালার্জি। নাকে একটু ধুলো গেল কি হাঁচি শুরু হয়ে গেল। একটুতেই সর্দি। মারাত্মক রোগ। তবে এই ওষুধ পাবার পর থেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

আমি বললাম, "দেখুন, ডাক্তার হিসেবে তো বটেই তাছাড়া নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি এই এ্যালার্জি সর্দি সম্পূর্ণ সারানো যায় না। কিছুটা রিলিফ পেলেও আবার হতে পারে। আমি নিজেই ঐ মারাত্মক রোগে ভুগছি। যখন এই সর্দির আক্রমণ হয় কাজ-কর্মের তখন বারোটা বেজে যায়। অ্যান্টি এ্যালার্জি কিছু ট্যাবলেট সব সময় সঙ্গে রেখে দি। নাক সুড়সুড় করতে শুরু হলেই খেয়ে নি। তাতে কিছুটা রিলিফ পাওয়া যায়। তবে ডাক্তার হিসেবে বলতে পারি এই মারাত্মক রোগ সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেবার মত কোন ওষুধ নেই।

ভদ্রলোক এবার মৃদু হেসে বললেন, "এটা কোন ডাক্তারি ওষুধ নয়। এক সন্ন্যাসী আমাকে দিয়েছিলেন। যেদিন থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে সব সময় পকেটে রেখে দিয়েছি, সেদিন থেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।"

আমি এবার আগ্রহের সঙ্গে বললাম, "আমি বহুদিন যাবত ঐ একই রোগে ভুগছি। সন্ন্যাসীর দেওয়া ঐ টোটকা

ওষুধ যদি আমাকে বলেন, তবে খুবই ভাল হয়।”

ভদ্রলোক এবার জামার বুকপকেট থেকে ছোট্ট একটা ‘গীতা’ বার করলেন, তারপর বললেন, “এটাই আমাকে সন্ন্যাসী দিয়েছিলেন আর সব সময় কাছে রাখতে বলেছিলেন।”

সেদিন ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছিলাম।”

এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলার পর ডাক্তার ঘোষ চুপ করলেন। ততক্ষণে বাড়ির ভেতর থেকে গরম গরম পাঁপড় ভাজা, চানাচুর আর দু-কাপ ধোঁয়া ওঠা চা এসে গেছে। আমরা দুজনেই পাঁপড় ভাজায় কামড় বসিয়ে চায়ের কাপ তুলে নিলাম। ডাক্তার ঘোষ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আবার তাঁর কাহিনী বলতে শুরু করলেন, “আমাকে অনেকে বদনাম দেয় আমি নাকি খুব ভুলো প্রকৃতির মানুষ। আসলে যখন কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকি, তখন প্রায়ই পারিপার্শ্বিক কিছুই খেয়াল থাকে না। অন্য সব কাজ ভুলে যাই।

এ রোগটা কিছুটা কমলেও সম্পূর্ণ সারেনি। কিছুদিন আগেই এক রোগীর অদ্ভুত একটা কেস নিয়ে ছাদে পায়চারি করতে করতে এত গভীর ভাবে চিন্তা করছিলাম যে, কখন আকাশ কালো হয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে টেরও পাইনি। হঠাৎ চাকরটার ডাকে হুঁশ ফিরলো। ততক্ষণে অবশ্য একেবারে ভিজে চ্যাপচ্যাপে হয়ে গেছি। যাহোক প্রতিদিন সন্ধেবেলা একটু পায়চারি করে বেড়ানো আমার বরাবরের অভ্যেস। কোনদিন চলে যাই গঙ্গার ধারে কখনো বা রেল লাইনের ধার দিয়ে স্টেশনের কাছে। সেদিনও আস্তে আস্তে হেঁটে চলছিলাম। সন্ধে হয়ে আসছে। সমস্ত আকাশ সিঁদুর রাঙা মেঘে ছেয়ে আছে। বেশ ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে! লাল মেঘগুলোর ওপর দিয়ে ডুবন্ত সূর্যের কিছু রশ্মি বেরিয়ে আসছে। চারপাশের সবুজ গাছপালায় ঝাঁক ঝাঁক ছোট পাখিদের কিচ্‌কিচ্‌ ডাক। চারদিকে সুন্দর একটা সোঁদা মাটির গন্ধ। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। প্রকৃতির এই সুন্দর মোহময় রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম, অবাক হয়ে দেখছিলাম তাল-গোল পাকানো মেঘের মেলা। বড় বড় মেঘের স্তূপ দিয়ে কত রকম সুন্দর মূর্তি তৈরি হয়েছে। এই যেন একটা বিরাট ভালুক, আস্তে আস্তে সেটাই আবার মাথায় মুকুট পরে সিংহাসনে বসে মহারাজা হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিখুঁত কোট প্যাণ্ট মাথায় টুপি এক সাহেব। হঠাৎ মনে হল প্রকৃতিকে এত সুন্দর এত মনোরম করেছে যে, সে নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি সুন্দর। কারণ সুন্দরই তার সৃষ্টিতে সৌন্দর্যের ছোঁয়া লাগাতে পারে। কোন এক সময় পড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধর্ম-প্রসঙ্গে বইটির কথা মনে পড়ে গেল। রাখাল মহারাজ বলেছেন, অনন্ত জীবন পড়ে আছে, তার থেকে না হয় এ জন্মটা অর্থাৎ খুব বেশি হলে একশ'টা বছর ভগবানের জন্যে দিয়ে দিতে। মনে হল প্রকৃতিকে এত সুন্দর করে যিনি সৃষ্ট করেছেন তাঁর জন্যে, তাঁকে পাবার জন্যে আকুল হওয়া যায় বটে। ভাবা মাত্রই তর্ক এসে গেল, ভগবানের রূপ তো প্রচণ্ড ভাবের প্রকাশ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য নরেন্দ্রনাথের মত একরোখা এবং বিচার বিবেচক ছেলেকেও ভগবান চিন্তায় কাঁদিয়ে ছেড়ে-

ছিলেন, কিন্তু এখনকার ধর্ম বিলানো পণ্ডিতের দল শুধু কতকগুলো অং বং মন্ত্র পড়ে আর নিজেদেরই জগৎগুরু পরমব্রহ্ম মনে করে। মুখে যদি মন্ত্রই পড়বো তাহলে মনটা ভগবানের চরণে যাবে কেমন করে?

গভীরভাবে এই সব চিন্তা করতে করতে রেল লাইনের কাছে এসে পড়েছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড ইলেকট্রিক ট্রেনের হুইসিলের শব্দে চমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোন্নগর-স্টেশন ছেড়ে একটা ট্রেন বেশ স্পিড নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। একটু হলেই অ্যাক-সিডেন্ট হত। লাইনের ঠিক ফুট তিনেক দূরে আমি থমকে থেমে গেছি। হঠাৎ ঠিক পেছনে একটা প্রচণ্ড জোরে বোমা ফাটার মত আওয়াজ হল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কেউ যেন আমাকে শূন্যে ছুড়ে দিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখি ট্রেনের কামরায় শুয়ে আছি। চারপাশে অনেকগুলো অচেনা লোকের মুখ। আস্তে আস্তে সবই শুনলাম। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কি ভাবে আমি ট্রেনের ভেতর চলে এলাম। যারা ঘটনাটা দেখেছে তাদের কাছে শুনলাম, কোন্নগর ছেড়ে ট্রেনটা সবে স্পিড নিতে শুরু করেছে। এমন সময় ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি লাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, খেয়াল করিনি, খুব কাছেই দুটো ষাঁড় প্রচণ্ড লড়াই করছিল। তাদেরই একটা আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে পেছন থেকে শিং দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো, মারে তাতেই আমার দেহটা ছিটকে উঠে সামনের চলন্ত ট্রেনের ভেতর ঢুকে পড়ে, কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, সময়ের একচুল এদিক-ওদিক হলেই একেবারে ট্রেনের তলায় চলে যেতাম। এমনকি ইলেকট্রিক ট্রেনের দরজার মধ্যকার লোহার রডে লেগে দেহটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়তে পারতো, কিন্তু সে রকম কোন দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে একেবারে অক্ষত অবস্থায় দরজার ভেতর দিয়ে গলে কামরায় চলে এসেছি। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে পড়লো কিছুক্ষণ আগেই ভেবেছিলাম ভগবানলাভের জন্যে একটা জীবন তাঁর পায়ে দিয়ে দেওয়া যায়। তবে কী সে জন্যেই তিনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিছুদিন আগে আমার কাছে আসা রোগীটির কথা মনে হল। 'গীতা' কাছে রেখে দেওয়াতে সর্দি সেরে গেছে। তখন মনে মনে হেসেছিলাম। আজ মনে হল অসম্ভব নয়, যেহেতু তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। মনেতে অগাধ বিশ্বাস এসে গেল। ছোট্ট একটা 'গীতা' কিনে বাড়ি ফিরলাম।"

ডাক্তার ঘোষ তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। তারপর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মনিবাবু, সত্যি বলতে কী, সেদিন থেকে আমার সর্দি-এ্যালার্জি দূরে সরে গেছে। ডাক্তারী শাস্ত্র এর কাছে কিছুই না।"

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর ভাবলাম, গিরিশ ঘোষের মত লোককে স্থির বিশ্বাসে যে ডুবিয়ে রেখেছিল, সেই একই শক্তি ডাক্তার ঘোষের মনেও অটুট বিশ্বাস জাগিয়েছে। এই বিশ্বাসের কিছুটাও যদি সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকতো, তাহলে আজকের পৃথিবীর বুকে স্বর্গ নেমে আসতো।

হানাবাড়ির রহস্য—উজ্জ্বল ও প্রজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

আয়তো, এগিয়ে দেখি
চল।
এটা এল কি করে? সত্যিই কি তবে ভূত আছে?
ভেতরে গেলেই মনে হয় সব বোঝা যাবে! আয়।
ভেতরে কী আছে কে জানে?
আঁ–আঁ–একি!
কী হল?
ঐ দ্যাখ! কংকালটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে!
আশ্চর্য তো! এটা কী করে হয়?
!?!
?!?!?
ওঃ এই ব্যাপার! স্পেশ্যাল কায়দায় তৈরী, কিন্তু...
বাড়ীর ভেতরেই সব কিছুর জবাব আছে।
কংকাল-টংকাল তো আছে, ভূত কই?

৮

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ২২ ॥

অনুরোধের অর্থ

আমি আর মেঘনাদ প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—না, আপনার এ অনুরোধে আমরা কিছুতেই সম্মত হতে পারি না। এ অমানুষিক, এ উন্মত্ততা।

ডক্টর রায়চৌধুরীর চোখ দুটো এখন হায়নার চোখের মতো হিংস্রতায় জ্বল-জ্বল করছে। খসে পড়েছে এতক্ষণের ভদ্রতা আর সৌজন্যের মুখোসটুকু। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কিন্তু রাজি যে তোমাদের হতেই হবে আগন্তুক বন্ধুরা, পৃথিবীর একান্ত নিরালা কোণে তৈরি করেছিলাম আমার নিজস্ব গবেষণার জগৎ—এ যাবৎ কেউ মাথা গলাতে পারে নি....কিন্তু আজ আমার ফেলে আসা পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য স্বার্থপর মূর্খ মানুষ আবার হানা দিয়েছে আমার এই সাধনক্ষেত্রে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না....।

ডক্টর রায়চৌধুরীকে আর মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। হাত দুটো কেবলই মুষ্টিযুদ্ধ হচ্ছে। দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন নীচের ঠোঁটটা।

—কিন্তু আমাদের আপনি বৃথাই সন্দেহ করছেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ড্রাগন পাহাড়ের প্রকৃত রহস্য ভেদ করা। মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হোল ও ভেতরে ভেতরে বেশ কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় তা মোটেই অস্বভাবিক নয়।

—মূর্খ! বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন—তোমাদের দুঃসাহসের পরিণাম তোমাদেরই বহন করতে হবে। স্বেচ্ছায় জীবন্ত সিংহের গুহায় কেউ প্রবেশ করলে সিংহ কখনও তাকে ছেড়ে দেয় না। তোমাদের সম্পর্কে প্রতিদিনের খবর আমার জানা। নিজেদের খুবই চালাক এবং হিসেবী ভেবেছিলে, তাই না?

মনে মনে আবার শিউরে উঠলাম। সত্যিই কি আমাদের সবটুকু কর্মধারা জেনেছেন উনি ? ক্যাপটেন সিং তাঁর অনুসরণের কথাটাও কি জেনেছেন ? যদি জেনে থাকেন তবে তো এতক্ষণে তাঁকেও কোথাও গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে। ভাবতেই চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠলো।

বিজ্ঞানী ডক্টর রায়চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এক ক্রুর ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে। বললেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞানের এক মহান গবেষণার স্বার্থে তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চলেছ।

—না। আমি চিৎকার করে উঠলাম —এ কাজ আপনি করতে পারেন না ডক্টর রায়চৌধুরী।

—ড্রাগন পাহাড় আমার রাজ্য। এখানে আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই। আমি আমার জীবন আর গবেষণার কাহিনী শুরু করার আগে আমার সর্তের কথা বলেছিলাম। এটাই আমার সর্ত। তা ছাড়া সব কিছু জানার পর আমার অনুরোধে রাজি হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি ?

—কিন্তু আমরা আপনার সর্ত বা অনুরোধে রাজি হয়েছি একথা তো বলিনি, মেঘনাদ বললো।

—তোমাদের মতামতের দাম আমার কাছে আর কিছুই নেই। তোমাদের আমার পক্ষে আর এ গবেষণাগার থেকে যেতে দেওয়াও সম্ভব নয়।

—কারণ ?

—কারণ তোমরা স্বেচ্ছায় এই ভয়ঙ্করের গুহায় পা দিয়েছ। এখানে ঢোকার পথ খোলা, কিন্তু বেরুবার পথ বন্ধ। তা ছাড়া আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে নতুন মানুষ দরকার। প্রতি বৈশাখী অমাবস্যার রাতটির অপেক্ষায় আমি বেশ কয়েকটি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করি, কিন্তু আমার পোষা ডাইনোসর এবার যাকে আদিবাসী গ্রামের ড্রাগন বেদী থেকে তুলে এনেছে সে শিপকি উপত্যকার কোন পাহাড়ী আদিবাসী তরুণ নয়—কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী দুঃসাহসী যুবক মেঘনাদ ভরদ্বাজ। বলতে বলতে ডক্টর রায়চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠলেন—ক্ষতি আমার তাতে কিছু হয়নি বরং সঙ্গে আছে আর একটি তাজা তরুণ শরীর। আমার গবেষণার নতুন ফরমুলা আমি আজ রাতেই তোমাদের ওপর প্রয়োগ করবো।

আতঙ্কে হিম হয়ে গেলাম।

বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী আগের মতোই কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন—তবে আমার আশা হয়তো এবার আর ব্যর্থ হব না। ইতিমধ্যেই এই দীর্ঘ তিরিশ বছরে মানুষের শরীরের 'জিন'এর ওপর আমার বিশেষ কেমিক্যাল ট্রিটমেণ্ট অনেকটা সফল হয়েছে। একজন মানুষকে এভাবে ছ'মাস পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। আমি এবার আশা করি সবটুকুই সফল হব। তাহলে এই পৃথিবীতে তোমরাই হবে জরা, ব্যাধিজয়ী সর্বপ্রথম দীর্ঘজীবী মানুষ। মানুষ থেকে অতিমানুষ সৃষ্টির স্বপ্ন হবে আমার সার্থক।

—কিন্তু অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের ধরে এনে বছরের পর বছর এই অনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে ? গবেষণার নামে এ নির্মম হত্যাকাণ্ড। মেঘনাদ তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলো।

—হ্যাঁ, আমি নির্মম। রাগে বীভৎস

আকার ধারণ করেছে বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মুখমণ্ডল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমাদের সভ্য মানুষের ন্যায় নীতি, মূল্যবোধ নিয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। মানুষের সভ্যতার সত্যিকারের অগ্রগতির পথে রক্ত চাই, আরও রক্ত। এ সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আজ রাতে না হয় আরও দুটি প্রাণের বলিদান হবে মানুষের আগামী কল্যাণের বেদীমূলে।

প্রচণ্ড ক্রোধ আর উত্তেজনায় নিজের শারীরিক আঘাত আর অবসন্নতার কথা বিস্মৃত হয়ে মেঘনাদ ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর ওপর।

কিন্তু তার আগেই গুলির আওয়াজ। পর পর একসঙ্গে অনেকগুলো। না, গুহার মধ্যে নয়—আওয়াজ আসছে দূর থেকে।

প্রায় ঝড়ের মতো বেগে যে রমণীটি গুহা ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকলো, তাকে আমরা চিনি—সে শিপকি উপত্যকার পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামের দেবীরাণী।

জ্যাঠামণি সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের গুহা আক্রান্ত।

॥ ২৩ ॥

(অমানুষিক যুদ্ধের পরিণাম)

অকস্মাৎ বজ্রপাতের পর হঠাৎ যেন এক নৈঃশব্দ্য নেমে এল, কয়েকটি শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত। তারপরই বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন—কে আক্রমণকারী ? কার এতদূর স্পর্ধা ?

—ক্যাপটেন সিং তার লোকজন নিয়ে এসে গুহা ঘিরে ফেলে আক্রমণ শুরু করেছে দেবীরাণী ওরফে মিতালী দেবী জানালো।

—ক্যাপটেন সিং। মানে সেনাবাহিনীর সেই ছুঁচোটা। নিজের সমস্ত কাজ ছেড়ে গত কয়েক মাস যাবৎ এই শিপকি উপত্যকায় বা তাতের ঘ্রাণ শুঁকে বেড়াচ্ছিল ? ডক্টর রায়চৌধুরী অস্থির ক্রোধে সারা ল্যাবরেটারী গুহাটার মধ্যে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

বাইরে গুলির আওয়াজ ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। ডক্টর রায়চৌধুরী আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রোধ আর ঘৃণায় মুখটা ওঁর বিকৃত দেখাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—বিশ্বাসঘাতক তোমাদের আমি রেহাই দেব না। এখন বুঝতে পারছি এ সবই তোমাদের পূর্বপরিকল্পিত ছিল। এতদূরে পালিয়ে এসেও তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি।

একটা ছোট্ট শিশি থেকেই ইনজেকসানের সিরিঞ্জে কি এক তরল ভরে নিলেন, তারপর মুখে ভয়াল হিংসা ফুটিয়ে বললেন, এক্ষুণি এই সিরিঞ্জের তরল তোমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেব আমি। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আর কোনদিন কারুর সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না।

ইনজেকসানের সিরিঞ্জটা নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছেন উন্মাদ বিজ্ঞানী।

আতঙ্কে সারা শরীরটা আমার পাথরের মতো জমে গেছে। কণ্ঠ থেকে এক টুকরো শব্দ পর্যন্ত বেরুচ্ছে না।

মনে মনে ভগবানকে ডাকলাম চাইলাম, কিন্তু দুঃসহ ভয়ে কোন ভগবানের নাম মনে পড়লো না। (৪৫ পৃষ্ঠায় দেখ)

ধারণা

অনেকেরই ধারণা মরুভূমি মানেই ধূ ধূ বালুকারাশি। তাই সাহারা মরুভূমির বুক জুড়ে মাইলের পর মাইলের বালির পাহাড়, সত্যি সত্যি কিন্তু তা নয়। সাহারার ছ'ভাগের এক ভাগেরও কম অংশ বালু দিয়ে ঢাকা। এই মরুভূমির বেশির ভাগটাই পাথুরে এবং সমতল তো নয়ই, খুবই পার্বত্য অঞ্চল।

রক্তে সমুদ্র

কথায় বলে ব্রিটেনবাসীর রক্তের প্রতি কণায় সমুদ্র। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, ব্রিটিশ, দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি শহর কি গ্রাম সমুদ্র থেকে পঁচাত্তর মাইলের মধ্যে। সমুদ্রে ঝড় হলে, এই দেশের দূরতম অঞ্চলও সমুদ্রের জলকণায় সিঞ্চিত হয়ে থাকে।

পথে, ঘাটে স্বাস্থ্যরক্ষা

চীনের রাজধানী বেজিং'এ সাবধান-বাণী জারি করা হয়েছে এই মর্মে যে পথচারীরা যদি রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে থুতু ফেলেন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ফাইন হবে ৫০ ফেন। আর রাস্তাঘাটে মলমূত্র কিংবা আবর্জনা ফেললে মাস-মাইনের দশ ভাগের এক ভাগ ফাইন দিতে হবে।

পরিবেশদূষণের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই এই স্বাস্থ্যবিধি।

রয়টার

প্রাচীন গুহা আবিষ্কার

মেদিনীপুরের দেব পাহাড়ের এক পুরোণ গুহায় পুরাতত্ত্ববিদরা মধ্যপ্রস্তর-যুগের একজন গুহাবাসী মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। পাথর আর জঙ্গলে ঢাকা গুহার দেয়ালে সন্ধান পাওয়া গেছে হাতে আঁকা আশ্চর্য সুন্দর ছবি। ছবিটি গরুজাতীয় কোন প্রাণীর। এ ছাড়াও গুহা থেকে পাওয়া গেছে আদি প্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তরযুগের কিছু অস্ত্র-শস্ত্র—কুঠার, কাটারিজাতীয় এবং কিছু ভাঙ্গা মাটির পায়ের টুকরো।

ব্ল্যাক হোল

পৃথিবী থেকে মাত্র ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে খুবই সম্ভব যে একটি ছোট ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে। এই অনুমান সম্প্রতি একদল মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের।

অভিকর্ষের প্রবল টানের ফলে কোনও নক্ষত্র সঙ্কুচিত হয়ে এই কৃষ্ণগহ্বরে রূপান্তর হয়। তখন চারপাশের সমস্ত বস্তুর প্রতিই তার তীব্র আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ থেকে আলোও রেহাই পায় না।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেছেন এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কৃষ্ণগহ্বরটি একটু শান্ত প্রকৃতির।

ইউ. পি. আই

ডাইনোসরদের বিলুপ্তি

ব্রিটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী এন. আর. ক্রফ্‌ট বলেছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনো-সরদের বিলুপ্তির কারণ সম্ভবতঃ তাদের অন্ধ হয়ে যাওয়া। পৃথিবীর আবহাওয়া-মণ্ডলের বিবর্তনে সূর্যের তাপ থেকে ডাইনোসররা রক্ষা পায়নি। তাদের চোখে ছানি পড়েছিল।

মিণ্টুর জন্যে

দেবাশীষ সরখেল

মিণ্টু অবাকচোখে কলম করা আমগাছটার দিকে চেয়ে আছে। এইটুকু তো গাছ। অনেকগুলো আম ধরেছে। ভাবাই যায় না।

রিণ্টু পিছন থেকে মৃদু থাপ্পড় মারলো মিণ্টুর পিঠে।

মিণ্টু পিছন ফিরে বললো, দাদা, গাছের তুলনায় আমগুলো অনেক। কি, তাই না? দ্যাখ, নিচের ডালটায় আম দু'টোর রঙ সিঁদুরে হয়ে এসেছে। আমরা কিন্তু সবগুলো পেকে লাল না হওয়ার আগে কেউ ছোঁব না।

রিণ্টু রেগে গেল। তোর মাথায় একদম কিচ্ছু নেই হাঁদারাম। গাছের ফলের দিকে আঙুল বাড়ালে কি হয় জানিস?

মিণ্টু জিগ্যেস করলো, কেন? কি হয়?

—তোমার মুণ্ডু হয়। বলেই রিণ্টু আর দাঁড়ালো না। চলে গেল।

মিণ্টু নিজের মনেই হাসলো। আসলে তার দাদাও জানে না হাত বাড়ালে কি হয়। সে আরেকবার একটা সিঁদুরে আমকে লক্ষ্য করে আঙুল বাড়ালো।• দেখাই যাক না কি হয়?

পরদিন গাছটার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, আরেকটা আমে পাকা রঙ ধরেছে। মিণ্টুর ভারি জানতে ইচ্ছে করলো আমগুলো টক না মিষ্টি? না খেলে তো আর জানা যায় না। আর একটা খেলেই বা ক্ষতি কি? কেউ জানতে পারবে না। রিণ্টু যদি বা গাছটার দিকে তাকায় দুটো পাকা আমই দেখতে পাবে। আরেকটা তো পেকেছে, কিন্তু মিণ্টুর পুরো কাণ্ডটাই একটু ভুলের জন্য ধরা পড়ে গেল। রিণ্টু দেখতে পেলো গাছের তলায় একটা আমের আঁটি পড়ে। তখুনি সে মিণ্টুকে ডেকে জিগ্যেস করলো, কি রে? আম পেরে খেয়েছিস, আর কাল যে খুব লেকচার দিচ্ছিল সবগুলো না পাকলে খাব না।

এগারো বছরের মিণ্টু মিথ্যেকথা বলায় তত পটু নয়।

আমতা আমতা করে বললো, না, আমি খাইনি তো।

রিণ্টু একটু জোর দিয়ে জিগ্যেস করলো, খাস্নি তো ঐ আঁটিটা কি উড়ে এলো?

মিণ্টু বললো, খাইনি। আসলে ওটা কি হয়ে গেছে?

—হয়ে গেছে, মানে?

মিণ্টু থেমে থেমে বলে ঐ যে কাল তুই বললি না দাদা, ফলের দিকে আঙুল বাড়ালে কি হয়ে যায়। তাই বোধ হয়, কিছু হয়ে গ্যাছে।

রিণ্টু এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল। বললো, কিছু হয়ে গেছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। হয়ে যাওয়া বার করছি। মা'কে আমি সব বলছি।

মা মিণ্টুকে তখুনি ডাকলেন। বকুনি দিলেন না। শুধু স্নেহের গলায় বললেন, খেয়েছো তো কি হয়েছে? দাদাকে সত্যিকথা বলতে পারতে। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মিণ্টু স্পষ্ট দেখলো তার দাদাও একটা আম পেড়ে খেলো। মা'র কাছে নালিশ জানাতে সেও ছাড়বে কেন?

মা তখুনি রিণ্টুকে ডাকলেন, কিন্তু রিণ্টু সুন্দর মিথ্যেকথা বললো, মা মিণ্টু এবারেও মিথ্যে কথা বলেছে। ওই খেয়েছে।

মিণ্টু প্রতিবাদ করতে পারতো কিন্তু করলো না। মনে মনে বললো, দাদা তুইও মিথ্যে কথা বললি। তুইও আমার মতো অবিশ্বাসী হয়ে যাবি।

পরদিন মিণ্টুর দিদি মণীষাও একটা আম পেড়ে খেয়ে মিণ্টুর নামে মা'র কাছে মিথ্যে নালিশ জানালো। মিণ্টু মনের দুঃখে কিছু বললো না।

সেদিন রাত্রিবেলায় ভীষণ ঝড়। মা'কে সে ঘুমের ঘোরেই জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, মা বাইরে কি ?

মা বললেন, ঝড় বইছে।

তখুনি মিণ্টু তার মায়ের ঠাকুরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানালো, ঠাকুর যেন গাছটা আজ রাত্তিরের ঝড়েই পড়ে যায়। তা'হলে আমরা আর মিথ্যাবাদী হয়ে উঠবো না।

সকালে সবাই দেখে হায় হায় করে উঠলো। অত সুন্দর ফলন্ত কলমের আমগাছটা। শুধু খুশী হয়েছে মিণ্টু !

মিণ্টু তার দাদা দিদি দু'জনকেই ডেকে বললো, জানিস। কাল রাতে ঝড়ের সময় মনে মনে মায়ের ঠাকুরের কাছে গাছটা পড়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।

রিণ্টু বললো, কেন ? প্রার্থনা করেছিলি কেন ? আর মায়ের ঠাকুর তোর কথা শুনবেই বা কেন ?

মিণ্টু বললো, শুনেছেন কি না জানি না। কিন্তু গাছটা পড়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। ও আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তাই বন্ধুরা মিথ্যুক হয়ে উঠুক ও চায় নি। এর পর থেকে আমাদের মিথ্যে কথা বলার আর কোনো কারণ থাকলো না।

মিণ্টু রিণ্টু মণীষা ওরা তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকলো।

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

আর বাঁচার কোন পথ নেই। মাথার মধ্যে লক্ষ ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ডক্টর রায়চৌধুরী আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরে সিরিঞ্জ তুলে ধরেছেন…আমি চোখ বন্ধ করলাম…

সেই মুহূর্তে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাইরে থেকে এক বিকট গর্জন শোনা গেল। এ গর্জন আমার চেনা। সেই বিশাল ডাইনোসরটার ডাক। ডাকটা যেন এখন আরও ভয়ংকর আরও হিংস্র।

ঝড়ের বেগে কে যেন ঘরে প্রবেশ করলো। কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি ল্যাবরেটরী গুহার একজন প্রহরী। শরীর দিয়ে তার রক্ত ঝরছে।

উত্তেজিত দুর্বোধ্য কণ্ঠে কি যেন সে বলে চললো শুনতে শুনতে আর্তনাদ করে উঠলো দেবী রানী তারপর প্রহরীর পিছু ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বুঝলাম আরও একটা কিছু সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটেছে। তাকিয়ে দেখি বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী পাষাণের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওর চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না।

'মেঘনাদ ইঙ্গিত করলো—অর্ণব এই সুযোগ।

আমরা দৌড়ে বেরিয়ে এলাম গুহাঘর থেকে।

সামনে টানা গুহাপথ। ফাঁকা, কেউ এল না আমাদের বাধা দিতে। আমরা এগিয়ে চললাম। বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ। সেই সঙ্গে ডাইনোসরের গর্জনটা আরও ভয়ংকর মনে হচ্ছে।

আমরা গুহা পথের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

(আগামী সংখ্যায় শেষ টুকু পড়)

কাকুর দেওয়া পেনটা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল মাম্পি। দেখেই বেবি লাফিয়ে উঠল—'ইস্, কি দারুণ রে পেনটা।'

'দারুণ?' ফিক করে হেসে ফেলল মাম্পি।

'বাঃ, হাসছিস কেন?' বেবি খিঁচিয়ে গেল—'পেনটা ভাল না বুঝি?'

'ভাল তো দারুণ বলছিস কেন?'

'দারুণ হলে দারুণ বলবো না—কি দুর্দান্ত পেন বলবো?

আবার হেসে ফেলল—মাম্পি—'বলিস কি, দুর্দান্ত?'

'সত্যি বলছি, ভীষণ ভাল হয়েছে পেনটা।'

এবার আর থাকতে পারলো না মাম্পি, হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ফটাস করে পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বেবি বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে?'

'মোটেই না।'

'তবে ওরকম পাগলের মত হাসছিস কেন?'

'তুই যে পাগলের মত কথা বলছিস।'

'আহা, পাগলের মত আবার কি কথা বললাম?'

'বললি না? পেন কখনো দারুণ হয়?'

'কেন হয় না?'

'দারুণ মানে হচ্ছে যা দারু দিয়ে তৈরি।'

'মানে? কাঠ দিয়ে তৈরি?'

'নিশ্চয়ই। পেন কি কাঠ দিয়ে তৈরি?'

বেবি আমতা আমতা করে বলল, 'অন্য কথাগুলো কি দোষ করল শুনি?'

'একটা কথা হল দুর্দান্ত। মানে বই খুলে দেখ, দুর্দান্ত মানে যাকে দমন করা যায় না। আর ভীষণ? ভীষণ মানে তো ভয়ংকর। পেনটাকে ভয়ংকর বললে হাসি পাবে না?'

বেবি মুখ গোমড়া করে বললে, 'অতো-শতো জানিনা বাপু, যা সকলে বলে তাই বললাম, কিন্তু এ সব কথা তোর মাথায় এলো কি করে?'

'মাথায় কি আর আমার এসেছে'—মাম্পি বললো, 'এ সব জিনিস কাকুরই মাথায় গজ গজ করছে। যে সব কথা হর-দম বলে যাই তার আসল মানে যে কি—যত শুনি ততো হেসে মরি।

'তোর কাকু বুঝি এ সব বলে? ইস্ কি মজা!'

'মজা তো বটেই, কিন্তু কাকু যে থাকে দুর্গাপুরে। যখন আসে আমরা আর ছাড়তেই চাই না—এক একটা শব্দ বলবে কাকু আর জব্দ করবে আমাদের। কি ভাল যে লাগে না।'

মাম্পির রিক্সা এসে গিয়েছিল, ও এগুছিল; বেবি ফিস ফিস করে বলল—'আমার যদি ওরকম একটা কাকু থাকতো।'

[মাম্পির কাকুর সঙ্গে আলাপ করতে খুব ইচ্ছে করছে, তাই না? না, আলাপ অবশ্য এক্ষুণি করা যাচ্ছে না, তবে তোমরা যারা ঝলমল পড়ো, তাদের জন্যে প্রত্যেক মাসে কাকুর ওই শব্দজব্দের খেলা চুপি চুপি শুনে এসে শোনাতে পারি। যা মজার না ব্যাপারটা। পরের মাসে শব্দ-জব্দের পাতাটা দেখতে ভুলো না যেন, কেমন?]

পরিচালনায়—পীযূষ রায়

আমার প্রিয় ঝলমলের বন্ধুরা,

ঝলমলের কিছু অদলবদলের খবর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তোমাদের জানিয়েছি। তোমাদের অনেক চিঠি পাচ্ছি। জানি তোমাদের কাছ থেকে সব সময়ই সহযোগিতা পাব। গত সংখ্যাটি বের করতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই তোমরা অনেকেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারনি—এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। যাতে ঠিক সময়ে তোমাদের প্রিয় ঝলমল বের করা যায় তার জন্য খুব চেষ্টা করা হচ্ছে। নতুন কলেবরের ঝলমল কেমন লাগছে জানাবে। 'বলতো ?' প্রতিযোগিতার নিয়ম কানুন সামান্য বদলানো হলো। ভাল করে পড়ে নিও।

পুরস্কার ও নিয়মাবলী

(১) প্রথম পুরস্কার—কুড়ি টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার—পনেরো টাকা
তৃতীয় পুরস্কার—দশ টাকা
(গ্রাহকদের জন্য)

যারা গ্রাহক নও তারা পুরস্কার পেলে—এ ববছরের গ্রাহক চাঁদার জন্য যে টাকা দিতে হবে তার বাকী অংশ পাঠালে তাদের এক বছরের জন্য গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

(২) এ মাসের প্রশ্নগুলির উত্তর এবং সফল প্রতিযোগিদের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

(৩) আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অতি অবশ্যই উত্তর সাদা কাগজে লিখে পাঠাবে।

(৪) উত্তর পত্রের সঙ্গে প্রবেশ পত্রটি অবশ্যই কেটে পিন করে পাঠাবে।

(৫) একটি প্রবেশ পত্রে কেবল মাত্র একজন প্রতিযোগী অংশ নিতে পারবে।

(৬) সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত সকল গ্রাহক ও পাঠক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

এ মাসের প্রশ্নমালা

১। কে লিখেছেন ?

(ক) রানুর প্রথম ভাগ
(খ) সন্দীপন পাঠশালা
(গ) Folk Tales of Bengal
(ঘ) The Merchant of vanice

২। কে সৃষ্টি করেছেন ?

(ক) অমল (খ) সুধা (গ) হাবুল সেন (ঘ) সিধু জ্যাঠা।

৩। কোনটি ঠিক ?

(১) মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল।

(ক) ১৭৭৫ সালে (খ) ১৭৮০ সালে (গ) ১৭৮৪ সালে (ঘ) ১৭৯০ সালে।

২। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরী হয়েছিল।

(ক) ১৬৮০ সালে (খ) ১৬৯০ সালে (গ) ১৬৯৭ সালে (ঘ) ১৭৫৭ সালে।

৪। এই দেশগুলির রাজধানীগুলি কোথায় অবস্থিত ?

(ক) ইতালী (খ) গ্রীস (গ) মিশর (ঘ) পাকিস্তান।

৫। নদীগুলি কোন দেশে প্রবাহিত ?

(ক) নীলনদ (খ) হোয়াং হো (গ) মেঘনা (ঘ) টেমস্।

৬। (ক) ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ?

(খ) ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান কে ?

৭। ছবি দুটির পরিচালক কে ?

(ক) হীরক রাজার দেশে (খ) বাড়ী থেকে পালিয়ে।

৮। এঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের অধিকারী ?

(ক) জারনেল সিং (খ) ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (গ) ওস্তাদ আলী আকবর খান (ঘ) যামিনী কৃষ্ণমূর্ত্তি।

৯। (ক) বিশ্বকাপে পেলে, ইউসোবিও, লেভইয়াসিন, বেকেনবাওয়ার প্রভৃতি কোন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ?

(খ) মোহনবাগান ভারতীয় দল হিসেবে কোন বছর লীগে অংশ নেয় ?

(১০) কে দলের বাইরে ?

(ক) ১৫, ৩৫, ৪৫, ৭৫

(খ) গুজরাট, হরিয়ানা, ওড়িয়া, বিহার, উত্তরপ্রদেশ

(গ) BY, CT, QU, DG, FX

(১১) এর পর কি ?

(ক) ৩, ৭, ১৭, ৩৯, ৮৫

(খ) ২, ৬, ২১, ৮৮

১। পিশেমশাই লম্বুকে বললেন দশ টাকা দুভাগ করতে। আর জম্বুকে বললেন দশ টাকাকে দু'টাকা করে ভাগ করতে। ওদের উত্তর পেয়ে পিশেমশাই দুজনের মাথা দুটো ঠুকে দিলেন। তোমরা বলতো কি উত্তর দিলে দুজনের মাথাই বাঁচতো ?

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর

১। (ক) Herman melville
(খ) Donial Defoe
(গ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
(ঘ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

২। (ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(খ) প্রেমেন্দ্র মিত্র
(গ) শিবরাম চক্রবর্তী
(ঘ) লীলা মজুমদার

৩। (গ) 1913

৪। (ক) প্রশান্ত মহাসাগর
(খ) মাউন্ট এভারেস্ট
(গ) জাপান

৫। (ক) Guten berg
(খ) Jhon Wolkar
(গ) Elias Howe
(ঘ) Thomas Alva Edison

৬। (গ) কলকাতা

৭। (ক) চিত্রাঙ্কণে
(খ) নৃত্যে
(গ) চলচ্চিত্র পরিচালনায়
(গ) সাহিত্যে

৮। (ক) মোহনবাগান—শঙ্কর ব্যানার্জী।
ইষ্টবেঙ্গল—অমল দত্ত
মহামেডান—নইমুদ্দিন
(খ) ধ্যানচাঁদকে

৯। (ক) 5 (খ) 6 (গ) 47 (ঘ) 201

১০। মাঝের সংখ্যাটিকে নয় দিয়ে গুণ করে।

১১। (ক) আমলকি
(খ) কাঁচি

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সফল প্রতিযোগিদের নাম

প্রথম পুরস্কার

গৌতম নিয়োগী, নৈহাটী, ২৪পরগণা
ঝুমা দত্ত, নবগ্রাম, হুগলী
সুদীপ্ত দাসগুপ্ত, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

দ্বিতীয় পুরস্কার

কস্তুরী সেন, কলিকাতা-২৮

তৃতীয় পুরস্কার

বরুণ সেন, কোন্নগর, হুগলী

Tapan Kr Majumdar

প্রবেশপত্র (আষাঢ় সংখ্যা)
'বল তো ?' সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা
ঝলমল
১, রাজেন্দ্র দেব রোড
কলিকাতা-৭

নাম — সুজন কুমার দে
বয়স — ১৫
ঠিকানা — রবীন্দ্রপল্লী, পো: হালিসহর, জি- ২৪পরগণা
গ্রাহক নং (গ্রাহকদের জন্য) — আমি গ্রাহক নই
তাং.................................. স্বাক্ষর... সুজন দে............

(১) ঘরে ঢুকে দেখি সাহিত্যিক বন্ধুটি সদ্য লেখা একটি গল্প ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে। বললাম, 'কি ব্যাপার, ছিঁড়ছো কেন?'

'আর বলো না,—গল্পটায় মারাত্মক সব ভুল থেকে গেছে।'

'সে কি, দেখি! দেখে আমি তো হাসি সামলাতে পারি না—এই কটা লাইনেই দশটা ভুল? তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো কি রকম ভুল! দেখো না পড়ে একবার—

"রামবাবুর প্রাণের বন্ধু বিপিনবাবু, দুজনে রিটায়ার করার পর বন্ধুত্ব আরো বেড়েছে—রোজ সন্ধ্যেবেলা দাবার ছক নিয়ে না বসলে বিপত্নীক রামবাবুর সময় কাটতে চায় না। রামবাবুর একতলা বাড়িটি ছিমছাম। দুটি ছেলে, দুজনেই পড়াশুনায় খুব ভাল, অশান্তির কিছু নেই। ঠাণ্ডা মানুষ রামবাবু, চেহারাটিও বেশ—একটা চুল পড়েনি, চুল পাকে-নি। দাঁতের যা জোর এখনো হাড় চিবোতে পারেন। বিপিনবাবুর বাড়ি কাছেই, মিনিট দশেকের রাস্তা।

রবিবারের বিকেল। রামবাবু সবে লাইব্রেরি থেকে আনা গল্পের বইটা খুলেছেন—কড়া নড়ে উঠল।

'দেখো তো কে আবার এলো'—দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন রামবাবু। ওপরের ঘর থেকে গিন্নি বললেন, 'কে আবার? তোমার প্রাণের বন্ধু।' বইটার ৪৭-৪৮ পাতার ফাঁকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি গুঁজে গজ গজ করতে করতে দরজা খুললেন রামবাবু। টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যে হবার সবুর সইলো না?'

বিপিনবাবু বললেন, চটছো কেন? একটু গল্প গুজব করতে এলাম।' 'চটবো না মানে? কেষ্টার মা কামাই করেছে—ঘরদোর নোংরা। মেজ ছেলেকে পাঠালুম, তা তার মেজাজ কি! জ্বর হয়েছে, সে খবরটা একটু জানাতে পারে না কাউকে দিয়ে?'

'আহা, কি করে জানাবে—একলা মানুষ, একটা ছেলেটেলে থাকলেও না হয়'—

'তুমি থামো। কালকে এলে রাত্তির করে, আজ একেবারে'

'কি করি বল, অফিস থেকে ফিরতে দেরি হল,—তারপর'—

'চুপ করো তো! দাবার ছকটা পাড়বো?'

'ইস্, দেখেছো কাণ্ড—চশমাটাই আনতে ভুলে গেছি'--বিপিনবাবু বললেন, 'বল্টাকে একবার পাঠাও না।'

'ক্ষেপেছো। ওকে দশটা অব্দি' গ্রামার মুখস্থ করতে বলেছি—গতবারের মত এবারও ফেল করবে নাকি?'

অগত্যা বিপিনবাবুকেই উঠতে হল। মিনিট পাঁচেক পরে যখন চশমা নিয়ে ফিরে এলেন, রামবাবু তখন ঘুঁটি সাজিয়ে ফেলেছেন।

—পরমা চট্টোপাধ্যায়

(২) কথায় কথায় বললেন ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ।' সেই উট সম্পর্কে তিনটে খবর তিনি তোমাদের দিলেন; যার দুটো ঠিক, একটা ভুল। কোন্‌টা ঠিক নয় সেটা তোমাদের বেছে দিতে হবে।

(১) একবারে উট প্রায় 122 লিটার জল পান করতে পারে।

(২) 18 ঘণ্টা এক নাগাড়ে, একটুও

বিশ্রাম না নিয়ে ঘণ্টায় 2½ মাইল বেগে উট হাঁটতে পারে।

(৩) উট তার পিঠের কুঁজের মধ্যে জল জমিয়ে রাখে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

ল্যাটা, চিতল, শোল, চাঁদা, কই, বোয়াল, বাটা, কাতলা, পুঁটি, রুই, চ্যাং, খলসে, তপসে, মাগুর, বাইন, ইলিশ।

২। ছোটদাদুর থলিতে ছিল ৫৬ টাকা, সেজদাদুর থলিতে ২৮ টাকা।

গত মাসে ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম বই দেরীতে বেরুনোর জন্য ধাঁধা উত্তর এসে পৌছায় নি। যাদের এসেছে তারা কেউই দুটো ধাঁধারই পুরোপুরি সঠিক উত্তর দিতে পার নি। মোটমুটি যাদের ঠিক হয়েছে তাদের নাম দেওয়া হল।

বর্ধমান—মানিক, শুভাশিষ, গোকুল, মমতা। কালনা বিরাটি—সীমা, মিলি, সুমিতা, অসীমা ও গানেশ দাদু।

হুগলি—রঞ্জনা, বিউটি, দোলা ও ঝর্ণা নবগ্রাম, বিলু, সিদ্ধার্থ ও পার্থ কোন্নগর।

কলিকাতা—তুষার ও তরুণকান্তি বারিক। বিশ্বনাথ, সুকুমার, প্রদীপ ও মানিক। শঙ্কর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য লোকনাথ সাউ, ও নীনা ঘোষ।

শব্দ বরফি

ইংরাজীতে "শব্দচিন্তা"

(ক) নিচের নামগুলোর ইংরাজী শব্দ বসিয়ে কর।

পাশাপাশি :

1. কুকুর, 2. বন্দুক, 4. আলো।

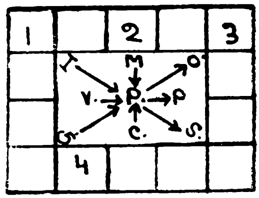

উপর নিচ :

1. হাঁস, 3. সুপুরী।

(খ) ভিতরের সাংকেতিক চিহ্নগুলির মানে কি?

—বৃশ্চিকজাতক।

গতমাসের সমাধান

পাশাপাশি :

১। অশোক, ৩। ঝলমল, ৪। কালিচরণ, ৭। সবিতা, ১১। কালিদাস, ১৪। থর, ১৫। নন্দলাল, ১৭। হকি, ১৮। ইন্দ্র।

উপর-নিচ :

২। কলকাতা, ৫। চরকা, ৬। রবীন্দ্রনাথ, ৮। বিবেকানন্দ, ৯। প্রকাশ, ১০। আন্দামান, ১২। শরৎচন্দ্র,, ১৩। শ্রীলঙ্কা, ১৬। লঙ্কা।

হাতে খড়ি

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

নতুন কলেবরে ঝলমলের এই সংখ্যাটা তোমাদের কেমন লাগছে? কি মজা, তাই না! এবার একেবারে পকেটে করেই নেওয়া যাবে। দামটাও কমে গেল। গ্রামবাংলার আমাদের বন্ধুদের দাবিও পূরণ হল, কি বল?

এবার কিন্তু এ বিভাগে তোমরা যারা লেখা পাঠাবে তারা যতটা সম্ভব ছোট্ট করে পাঠাবে, কেননা দেখতেই পাচ্ছো জায়গা অনেক কমে গেছে।

চিঠিপত্তর বিভাগে যে তোমাদের মন কেড়ে নিয়েছে তা তোমাদের চিঠি দেখলেই বোঝা যায়। আমরাও খুশী, কেননা আমরা জানতে পারছি তোমরা কি করলে আরও বেশী খুশী হও, আমরা তা করার চেষ্টা করি।

ভালোবাসা রইল—দাদাভাই।

দীঘা বেড়িয়ে এলাম

পারমিতা রায়

(বয়স—১০)

এ বছর এপ্রিল মাসে ১৭ তারিখে আমরা দীঘা-বেড়াতে গিয়েছিলাম। ১৭ই এপ্রিলে ভোরবেলা আমরা রওনা হলাম। সেদিনই বেলা ১টার সময় দীঘা পৌঁছে গেলাম। সেদিন বিকেলবেলা আমরা সবাই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলাম। তারপর সন্ধেবেলা একটু ঘুরেফিরে আবার হোটেলে পৌঁছে গেলাম। তারপর একটু অল্প করে রাত্তিরের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন ভোর ৫টার সময় উঠে আমি বেড়িয়ে পড়লাম সমুদ্রের ধারে যাবার জন্য। তারপর সমুদ্রের ধারে গেলাম। সমুদ্রের জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। আমার খুব মজা লাগছিল। অনেক ঝিনুকও কুড়ালাম। তারপর আবার হোটেলে ফিরে এলাম। পরে আবার ৮টার সময় আমরা রিক্সাভাড়া করে সব জায়গা দেখতে বেরোলাম। ওখানে একটা লেকে আমরা আধ ঘণ্টা নৌকা চড়লাম। তারপর ঘুরে এসে আমরা সমুদ্রে ১ ঘণ্টার মত স্নান করলাম। তারপর ফিরে এলাম। পরের দিনও সমুদ্রে স্নান করলাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোলাম। বিকেলবেলা কিছুটা ঘুরলাম। পরের দিন ছিল রবিবার। সেদিন সকালবেলা গোছগাছ করতে লাগলাম কলকাতায় ফিরবার জন্য। তারপর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

আমার পাখি

সম্রাট ঘোষ

বয়স—৭

সেদিন ছিল রবিবার। দিদিভাই, বৌদি, মিঠুদি, বাপী, সবাইয়ের ছুটি। খুব মজা, তার উপর আবার নূতন নূতন ঝলমল এসেছে। আমি ছাদে গিয়ে ঝলমলের ছবিগুলি দেখছি আর বানান করে করে আস্তে আস্তে পড়ছি। হঠাৎ দেখি একটা ছোট চড়াইপাখি আমার সামনে ঝপ্ করে পড়ল, আমি পাখিটার কাছে গেলাম, কিন্তু উড়ে পালালো না। আমি তখন পাখিটাকে তুলে নিলাম এবং নিচে নিয়ে এসে চুপি চুপি একটা ঝুড়ি-চাপা দিয়ে রেখে দিলাম, তারপর তুলো করে ডেটল নিয়ে এসে আস্তে করে

লাগিয়েছিলাম। একটু পরে হাতে করে দুটি মুড়ি এনে মুখে ধরলাম, একটা খেয়ে আর খেলো না। এই কথাটা সবাই বকবে বলে কাউকে বলিনি। তারপরের দিন থেকে খেতে দিলে পাখিটা খেয়ে নিত, আমি রোজ ঘুম থেকে উঠে এবং স্কুল থেকে এসে দেখতাম যে, পাখিটা কেমন আছে। ওর নাম রেখেছিলাম টুলু, ওকে নিয়ে রোজ বিকালবেলা খেলা করতাম, একটু করে টুলু উড়তে পারত। তারপর আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেল। একদিন বিকেলে টুলুকে নিয়ে ছাদে খেলা করতে নিয়ে গেলাম, টুলুকে হাতের উপর বসিয়ে দেখছিলাম ও উড়তে পারে কিনা, যেই একটু উড়িয়ে দিয়েছি ব্যস অমনি উড়ে গিয়ে দূরে একটা বট-গাছের ডালে বসল, আমি কত টুলু টুলু বলে ডাকলাম, টুলু কিন্তু এলো না। টুলুর জন্যে আমি খুব কাঁদতে লাগলাম, কিন্তু টুলু এত দুষ্টু যে, আর কোনোদিন আমাদের বাড়িতে এলো না। টুলুর সঙ্গে আমার আড়ি, টুলু এলেও আমি আর কোনদিন কথা বলব না।

আমার চোর ধরা

মধুমিতা ঘটক

আমাদের বাড়ির কাছে একটি বিড়াল ছিল, পুষি বিড়াল। তার নাম ছিল মিনি, রোজ সে আমাদের মাছ চুরি করে খেত, বাবা মাকে রোজ এ নিয়ে বকতেন। ফাঁদ পেতে মিনিকে ধরতে যেতেন, পারতেন না। আমি কিন্তু একদিন মিনিকে ধরে ফেললাম, চেঁচিয়ে মাকে ডাকলাম, 'মা' দেখ, তোমার চোর ধরছি'। মা বললেন, ছেড়ে দে তুই, নইলে কামড়ে দেবে, আমি তখন বিড়ালটাকে ছেড়ে দিলাম।

লোডশেডিং-এর মজা

পুর্বাণী ঘোষ (১৪)

লোডশেডিং-এর বেলায়
মন দিয়েছি খেলায়,
যেমনি আসে আলো
তেমনি মনটা কালো।
আসছে যে মা এদিকটা
কষতে হবে গণিতটা।

সিংহমামা

প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য (৬)

সিংহ মামা সিংহ মামা
গায়ে তোমার লাল জামা,
গোঁফে দেবে তা।
আস্ত একটা হরিণ ধরে
কড়মড়িয়ে খা।

রামলালের ব্যাবসা

রণদেব গোস্বামী

তেলে'র ব্যাবসা করে,
'রামলাল'-লালে লাল
পথে যেতে তার সাথে
দেখা হল গতকাল।
শুধালাম তারে,—'তেলে,
কি ভেজাল দিস্ বল' ?
চারপাশ দেখে নিয়ে,
'রাম' বলেছিল 'জল'।

মফস্বলের টুকিটাকী

তোমাদের এই বিভাগটার নাম দেওয়া হল মফস্বলের টুকিটাকি। তোমাদের অনেকের ছোটখাট অনেক খবর আমাদের দপ্তরে জমা হয়েছে। আমরা আস্তে আস্তে সেগুলো দেখছি। তবে খবর পাঠানোর সময় খেয়াল রেখো তোমার পাঠানো ঘটনা কি, কে, কবে কোথায় ঘটেছে সেটা যেন উল্লেখ থাকে।

যেমন ধর একজনের পাঠানো খবর দিয়ে তোমাদের উদাহরণ দিই। এই খবরটা পাঠিয়েছে মনীশ দাস হুগলী জেলার নবগ্রামে 'চার-দশ' নক আউট খেলা চলছিল গত ১ সপ্তাহ। ধরে এটা পরিচালনা করছিলেন সংহতি পরিষদ নামে একটি ক্লাব। বাচ্চাদের মধ্যে এই খেলা নিয়ে বেশ উদ্দীপনা উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু সেমিফাইনালে সমর্থকদের গণ্ডগোলে আপাতত খেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। বাচ্চাদের খেলায় বড়দের গণ্ডগোল করতে লজ্জাও করল না।

—দাদাভাই

ডাকাত ঠেকাতে পাহারা

মাসতিনেক আগে আমাদের পাড়ায় একটা বাড়িতে ডাকাতি হয়, গভীর রাতে। সেই বাড়ির সবাইকে বেঁধে রেখে মারধোর করে ডাকাতরা। সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। পরদিন সকালবেলা আমরা গিয়ে সেই ঘটনা জানতে পারলাম। পরে পুলিস এল, অনেক কিছু জিগ্যেস করলো তারা। তারপর চলে গেল, এর পরদিনেই পাড়ার বড়রা মিটিং করে ঠিক করলো রাত্রে রোজ পাহারা দিতে হবে। টর্চ, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি কেনা হল! সব বাড়ির বড়রা পালা করে সেই যে পাহারা দেওয়া শুরু করলো, তারপর থেকে কিন্তু আর ডাকাতের পাত্তা নেই। আমাদের পাড়ার দেখাদেখি আরো অনেক জায়গায় পাহারা শুরু হয়েছে, সকলেই এখন নিশ্চিন্ত।

—বাবুয়া কুণ্ডু

গল্প নয় সত্যি

সেদিন পাইকপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়ি গেছিলাম, সেদিন ছিল রবিবার। খাওয়া দাওয়া সেরে মাসতুতো দাদা পুলকের সঙ্গে জানলার ধারে বসে গল্প করছি এমন সময় ডুগডুগি বাজিয়ে এক বাঁদরওলাকে যেতে দেখে তাকে ডাকলাম। উদ্দেশ্য খেলা দেখার।

খেলা দেখবার সময় পথ চলতি অনেক লোক জুটে গেল। বাঁদরওলার সঙ্গে একটা ভল্লুকও ছিল। খেলা দেখতে সবাই যখন মশগুল তখন পুলকদা আমার কানে মুখ এনে বলল, ছিন্তাইবাজটাকে চিনতে পারছিস। তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো এই সেই লোক যে বাসের ভিড়ে আমার কানের দুল ছিনিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। মাথায় একটা প্ল্যান আসতেই একটা বাঁদরকে কাছে ডেকে ১টা টাকা দিয়ে লোকটাকে দেখিয়ে চড় মারতে মারতে আমার কাছে নিয়ে আসতে বললাম, আশ্চর্য বাঁদরটা কথামত নিখুঁত কাজ করল। লোকটা দোষস্বীকার করতেই পুলকদা ও সকলে মিলে লোকটিকে পুলিসের হাতে তুলে দিল।

—শুভ্রা মিত্র

খেলাধুলার আসর

আগামী সংখ্যার খেলাধুলার আসরকে বিশ্বকাপের বিশেষ আসর করা হচ্ছে এতে পাবে—

১। বিশ্বকাপের এক ডজন গপ্পো,

২। এবারের, বিশ্বকাপ ফাইন্যাল,

৩। এবারের বিশ্বকপের টুকিটাকি,

৪। বিশ্বকাপের মর্মান্তিক ঘটনা,

৫। ভারত কি শুধু বিশ্বকাপের খেলাই দেখবে,

৬। বিশ্বকাপ থেকে ফিরে আসা তিন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার।

বিশ্বকাপের বিচিত্র ঘটনা

শচীন কুণ্ডু

বিশ্বকাপ ফুটবলের লড়াই এখন উত্তেজনার তুঙ্গে। যা শুরু হয়েছিল জুনের তেরো তারিখ থেকে। এ লড়াই-এ জিতবে কে এ নিয়েই এখন দারুণ জল্পনা কল্পনা। এমনটা শুধু এবারই নয়। এর আগে যে কবার বিশ্বকাপের খেলা হয়েছে সে কবারও এমনি উত্তেজনা উম্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন পৃথিবীর সমস্ত ক্রীড়া-প্রেমিক মানুষ। আর তা নিয়ে কতই না চিত্র-বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে। যার মধ্যে হাসি কান্না সুখ-দুঃখ আনন্দ বিষাদ সব কিছুই লুকিয়ে আছে।

যেমন ১৯৬৬-র ঘটনাটিতে পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত হয়ে গেছিলেন প্রথমটায়। সেবার খেলা শুরুর মাত্র কদিন আগে বিশ্বকাপই চুরি হয়ে গেল। কোন চোরের এই কাজ! কারই বা এমন বুকের পাটা! ডাকা হল স্কটল্যাণ্ডের বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের। তবুও পাওয়া গেল না সোনার পরী জুলেরীমে ট্রফি। শেষপর্যন্ত উদ্ধার করলে সাধারণ একটা কুকুর। পিকলস নাম ছিল ওর। সকাল বেলা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই একটা বাড়ির পিছনের মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিল ও, হ্যাঁ মাটির নীচেই ছিল সেই বিশ্বকাপ। খবরের কাগজে জড়ানো অবস্থায়। ব্যাস তারপরে সেই কুকুরের কী খাতির। সব কাগজে ছবি বেরুলো। এমন কি ইংলণ্ডের রানীর পাশে বসে ফাইনাল খেলা দেখারও সুযোগ পেল। পিকলসের খুশী আর ধরে না। রানীর পাশে বসে লেজ নাড়ানোর সে কী ঘটা।

১৯৩০-এর প্রথম বিশ্বকাপে একটা দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছিল। খেলা চলছিল আমেরিকা বনাম আর্জেন্টিনার মধ্যে। ঘটনাটা ঘটলো হাফ টাইমের একটু পরেই। আমেরিকার একজন খেলোয়াড় পায়ে চোট পেয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন দারুণ যন্ত্রণায়। দলের কোচ ওষুধের ব্যাগ নিয়ে ছুটে গেলেন মাঠে। দৌড়তে গিয়ে ব্যাগ সুদ্ধু উল্টে পড়লেন তিনি। ব্যাগে মধ্যে ছিল ক্লোরোফর্মের শিশি, ভাঙবি তো ভাঙ্গ সেই শিশিটাই ভাঙ্গলো, ব্যাস ক্লোরোফর্মের গন্ধে অজ্ঞান হয়ে গেলেন কোচ মশাই নিজেই। কোথায় আহত খেলোয়াড়ের সেবা করবেন তিনি তার বদলে তাঁকেই ধরাধরি করে মাঠের বাইরে আনতে হল।

১৯৫৮তে বিশ্বকাপের আসর বসেছিল—

সুইডেনে। সেবার ব্রেজিল বনাম রাশিয়ার একটা খেলায় দারুণ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই জমে উঠেছিল। গোল হয় না, হয় না এই অবস্থায় খেলার ৭৭ মিনিটের মাথায় ব্রেজিলের ভাভা একক প্রচেষ্টায় একটা কাঁধে তুলবার চেষ্টা করলেন, কেউ বা ভাভার কাঁধেই চড়ে বসলেন। সতীর্থদের এত অভিনন্দনের চোটে বেচারা ভাভার অবস্থাতো কাহিল। খেলতে খেলতে ক্লান্ত তো ছিলেনই, আরো হলেন। মাঠেই শুয়ে

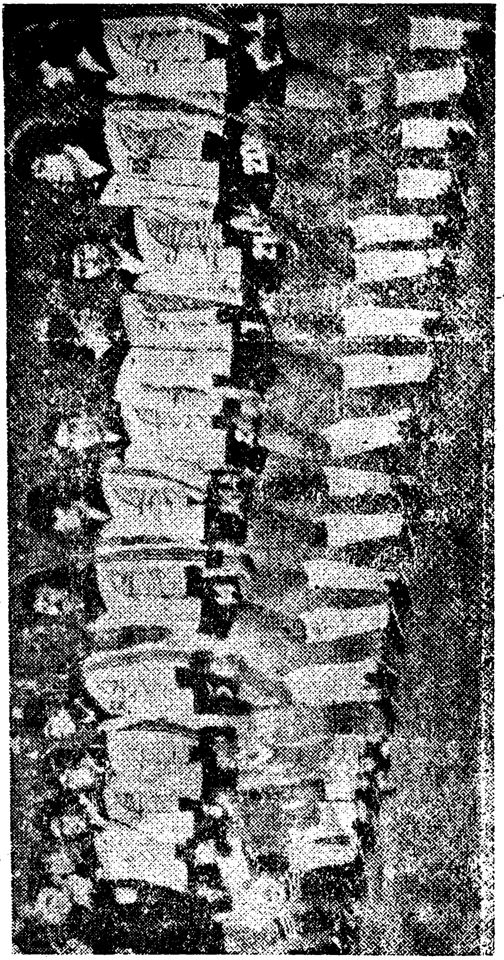

দুর্দান্ত গোল করে বসলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ব্যাস আর যায় কোথায়। ব্রেজিলের খেলোয়াড়রা গোলদাতা ভাভাকে অভিনন্দন জানাতে ঘিরে ধরলেন। কেউ চুমু খেলেন, কেউ জড়িয়ে ধরলেন, কেউ পড়লেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁকে মাঠের বাইরে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল। উল্লেখ্য সেবারই ব্রেজিল প্রথম বিশ্বকাপ জয়লাভ করেছিল সুইডেনকে হারিয়ে দিয়ে।

অর্জুন হাবিব

ঝলমল খেলাধুলো বিভাগ

সতেরোটা বছর শুধু কলকাতার মাঠেই কাটিয়ে দিলেন হাবিব। খেলতে খেলতেও যেন ক্লান্তি নেই। ফুটবল আর মাঠ, মাঠ আর ফুটবল শুধু এই স্বপনটুকু বুকের মধ্যে লালন করতে ভালোবাসেন বুঝি ইনি। কলকাতার তিন প্রধানের সমর্থকদেরও নয়নমণি হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন সময়। কখনো মোহনবাগান কখনো ইষ্টবেঙ্গলের, আবার কখনো বা মহামেডানের জার্সি গায়ে মাঠে আলোড়ন তুলেছেন। এ বছর তিনি ফুটবলে অর্জুন পুরস্কার পেলেন। ঠিক সতেরো বছরের মাথায়। কিন্তু কেন, কেন এতদিন পর মনে পড়লো ওঁর কথা? আরো অনেক আগেই কি হাবিবকে অর্জুন পুরস্কার দেওয়া যেত না? ভারতীয় ফুটবল সংস্থায় সেই ঘুম ভাঙলো, তবে বড্ড দেরীতে....

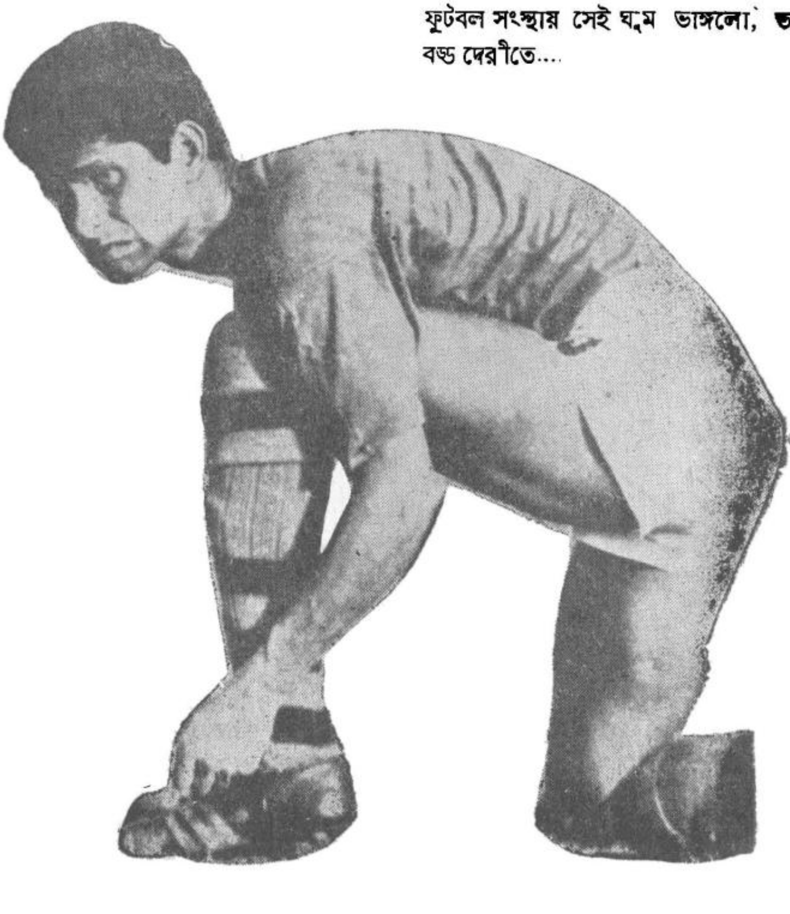

স্ট্রাইকার অরূপ দাস

অলোকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরূপ দাস ঃ

ইডেনে ছাব্বিবশে জুনের নায়ক অরূপ দাস বর্তমানে কলকাতা ফুটবলের অন্যতম প্রতিশ্রুতিবান স্ট্রাইকার। কলকাতার প্রথম ডিভিশনে খেলছেন ঊনআশি সাল হতে। ঊনআশি-আশি দুবছর খেলেন রেলওয়ে এফ্ সি দলের হয়ে। একাশিতে সবুজ-মেরুন দলে কাটিয়ে চলতি মরশুমে লালহলুদ দলে খেলার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের মতো বিখ্যাত দলে খেলার সুযোগ পেয়ে অরূপ গর্বিজ।

জন্ম ঊনষাট সালে আসামের করিমগঞ্জে। খুব ছোটো থেকেই খেলাধুলার সাথে আত্মীয়তা। বাড়ীতে, পাড়ার মাঠে, স্কুলে সর্বত্র খেলা নিয়ে মেতে থাকতেন রাত দিন। বাড়ীতে ফুটবল খেলার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পান দাদার কাছ হতে। ফুটবল খেলার হাতে খড়ি ঐ দাদার কাছেই। দাদা আসাম জাতীয় দলের হয়ে তিনবার প্রতিনিধিত্ব করেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন অরূপ। গৌহাটি টাউনক্লাবের হয়েও ফুটবল খেলেছেন। গৌহাটি প্রথম ডিভিশন লীগে খেলতে-খেলতেই স্ট্রাইকার হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

সেবার ঊনআশি সাল। কলকাতার রেলওয়ে এফ্ সি দল গৌহাটিতে বরদলুই ট্রফিতে খেলতে গেছে। রেলওয়ে এফ্ সি দল বনাম স্থানীয় কলেজের একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অরূপের খেলা দেখে বিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার নিখিল নন্দী তাকে কলকাতায় আনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতায় ফুটবল খেলার ইচ্ছা কার না হয়। অরূপও সঙ্গে সঙ্গে আসাম থেকে কলকাতায় পাড়ি দিলেন। নিখিল নন্দীই তাকে রেলওয়ে এফ্ সি দলে খেলার সুযোগ করে দেন। ঊনআশি এবং আশি সালে রেলদলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছেন। একাশিতে মোহনবাগানে আসার পর সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা জাতীর দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। একাশির শিল্ড ফাইন্যাল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে একটি সুন্দর গোল করে দারুণ চমক সৃষ্টি করেন। একাশিতে সিনিয়র ইণ্ডিয়া দলের হয়ে দুবারই সফরে যান। বিরাশির ঘরোয়া লীগ ফুটবলে মহমেডানের বিরুদ্ধে গোলটি করে আরো একবার স্ট্রাইকার হিসাবে নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। তবে ইস্টবেঙ্গল দলে স্ট্রাইকারের পজিশনে না খেলিয়ে তাকে আউটে খেলানো হচ্ছে বলে অরূপ বেশ অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো।

অরূপ বর্তমানে স্টীল অথরিটি ইন্ডিয়ার কর্মী। প্রিয় ফুটবলারের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সুরজিত সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করলেন। কলকাতা মাঠের বর্তমান স্ট্রাইকারদের মধ্যে আকবরের খেলা অরূপের সবচেয়ে ভালো লাগে। প্রিয় কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী। 'প্রদীপদা আর নিখিলদার কাছে ফুটবল জীবনে আমি বিশেষভাবে ঋণী'—অরূপ নিজেই কথার ফাঁকে বললেন। ভাস্কর গাঙ্গুলীকে গোলকীপার হিসাবে দারুণ শ্রদ্ধা করেন।

ফুটবলের ব্যাপারে দারুণ সিরিয়াস অরূপ। খুব বড়ো ফুটবলার হওয়া এখন তার ধ্যান জ্ঞান সবকিছু। জীবনের সেরা খেলার কথা জিজ্ঞাসা করতে অরূপ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন "না সেরা খেলা এখনো খেলিনি।" তবে আমাদের স্থির বিশ্বাস পাঁচফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার পাতলা চেহারার এই তরুণ ফুটবলার অদূরে ভবিষ্যতেই কলকাতা ময়দানের সুপার স্টার হতে পারবেন।

ময়দানে তিনপ্রধান, দর্শকদের মন কিন্তু বিশ্বকাপে

কৃষ্ণা পাল

১৯৮২-র কলকাতা ফুটবল লীগ শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগেই। তিন বড় দলেরও বেশ ক'টি খেলা হয়ে গেছে। সুতরাং, ময়দান পাড়া যে জমজমাট হবে তাতে আর সন্দেহ কী। অবশ্য বিশ্বকাপ ফুটবলও যে এই বাংলার অগণিত ফুটবল প্রেমিকদের আকর্ষণ করে নিয়েছে সে কথাই বা অস্বীকার করি কী করে! স্বাভাবিক। বিশ্বকাপ বলে কথা!

যাই হোক, এবার প্রথম মর্যাদার লড়াই মহমেডানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের। এই লেখা যখন প্রেসে দিচ্ছি তখনও অবশ্য খেলার মাত্র দিন কয় বাকী। যখন তোমরা পড়বে তখন নিশ্চয়ই জানা হয়ে যাবে মর্যাদার লড়াই-এ জিতল কে। এই বড় ম্যাচের আগেই মহমেডান হাওড়া ইউনিয়ানের সঙ্গে ড্র করে একটি পয়েণ্ট খুইয়েছে। সুতরাং গতবারের চ্যাম্পিয়ান মহমেডানের কাছে ম্যাচটির গুরুত্ব অনেক।

দলবদলের সময় তিন প্রধানই এবার নতুন মুখের সন্ধানে ছিল। কারণ তিন দলেরই বেশ কিছু অভিজ্ঞ ফুটবলার এশিয়ান গেমসের জন্য জাতীয় দলে যোগ দিয়েছেন। তিন প্রধানের এ পর্যন্ত যে ক'টি খেলা হয়েছে তাতে এই নতুন উঠতি খেলোয়াড়রা সকলেই যে দারুণভাবে সাড়া জাগিয়েছেন তা নয়। তবুও ইস্টবেঙ্গলের পুলক বিশ্বাস, বলাই মুখার্জী, কার্তিক শেঠ, বিশ্বজিৎ বসু, সুজিত চক্রবর্তী, মোহনবাগানের সত্যজিৎ ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু রায়, বিকাশ পাঁজি, কৃষানু দে, অমিতাভ মুখার্জী মহমেডানের শংকর অধিকারী, উত্তম চক্রবর্তী, প্রেম দোরজি এরা দর্শকদের কাছে ক্রমশই বিশ্বস্ত হয়ে উঠছেন।

ইস্টবেঙ্গল জিমখানাকে ৩ গোলে পরাস্তকরে তাদের মরশুম শুরু করেছিল। কিন্তু পরের ম্যাচেই কুমারটুলিকে শেষ সময়ে মাত্র ১ গোলে (তপন দাস) হারায় অনেক কষ্টে। তৃতীয় ম্যাচ স্পোর্টিং ইউনিয়ানকে ৩-১ গোলে হারায়। উল্লেখ্য এবার বড় দলের বিরুদ্ধে স্পোর্টিং-ই প্রথম গোল করলো। গোলদাতা গৌতম দত্ত প্রাধান্য বিস্তার করেই খেলেছিল। বিশেষ করে পুলক বিশ্বাস, সুধীর, কার্তিক, শেঠ ও সুজিত চক্রবর্তী বেশ আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে খেলেন। রেলওয়ে এফ সির সঙ্গেও ইষ্টবেঙ্গল নাম মাত্র গোলে জয়লাভ করে। গোলদাতা সেই কার্তিক শেঠ! গতি আছে। বুদ্ধিও। ফলে গোলও পাচ্ছেন।

মোহনবাগান ভ্রাতৃ সংঘ ও বরিষা স্পোর্টিংকে ৩—০ গোলে পরাস্ত করার পর ইস্টার্ন রেলকে মাত্র ১ গোলে হারিয়ে ২ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। পায়ের চোটের জন্য সুরজিত ও সুব্রত সেদিন না খেলায় মোহনবাগান কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। অথচ আগের দুটি ম্যাচে সুরজিত-শ্যাম-সুব্রতর উজ্জীবিত ভূমিকায় মোহনবাগানের পালতোলা নৌকা বেশ তরতরিয়ে এগিয়ে যায়। ১০ই জুন

ঐক্যের বিরুদ্ধেও অমিতাভ মুখার্জীর দেওয়া গোলে এগিয়ে দিল। কিন্তু সেদিনের প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ময়দানের সব খেলাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। ফ্ল্যাড-লাইট জ্বালিয়েও মোহনবাগান ঐক্যর খেলা শেষ করা যায় নি। খেলা শেষের তখন মাত্র ৭ মিনিট ছিল।

ওদিকে মহমেডান থেকে প্রসূন বিদেশ মানস ভাস্কর চিন্ময় প্রশান্তরা অন্য দুই প্রধানে চলে গেলেও ইস্টবেঙ্গল থেকে এসেছেন জামসিদ, মজিদ এবং খাবাজি এই তিন ইরানীর উপর সমর্থকদের অনেক ভরসা। প্রথম দুটি ম্যাচে জামশিদ মজিদ খেলেন নি। ওরা তখন আলিগড়ে। যাই হোক, কালীঘাট এবং বি. এন. আর-কে ২—০ গোলে হারানোর পর বেহালা ইয়ুথের সঙ্গে কিন্তু বেশ পরিশ্রম করে জিততে হয়েছে। তাও নাম মাত্র গোলে। গোলদাতা জামশিদ নাসিরী। বি. এন. আরের বিরুদ্ধেও তিনি গোল করেছিলেন। এর পর সোনালী শিবির এবং পোর্ট ট্রাস্টকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল মহমেডান। কিন্তু ধাক্কা খেল হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গেই। বড় ম্যাচের আগে বড় চোট সন্দেহ নেই। রেলওয়ে এফ. সির অলোক মুখার্জী জিমখানার বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম হ্যাট-ট্রিক করলেন। সুতরাং খুবই খুশী। এর পর রাজস্থানের বাদল ভট্টাচার্য পুলিশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন।

রেলওয়ে এফ সির লেফ্ স্টাইকার অলোক মুখার্জী ক্যালকাটা জিমখানার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন। মরশুমের প্রথম হ্যাটট্রিক। স্বভাবতই অলোকের খুশী হবার কথা। লিলুয়ার রেল কলোনীর ২৪ বছরের যুবক অলোক ময়দানে খেলা শুরু করেন '৭৫-এ দ্বিতীয় ডিভিসনে ভবানীপুরের হয়ে। '৭৬-এ ইয়ং বেঙ্গলে। ৭৭-এ জিমখানায় খেলে '৭৮-এ যোগ দেন রেলওয়ে এফ সিতে। ফুটবলের জন্যই রেলে চাকরী পেয়েছেন। ওর আদর্শ খেলোয়াড় হলেন মিহির বসু। কথা প্রসঙ্গে জানালেন পুলক বিশ্বাসের খেলাও ওর খুব ভালো লাগে।

দেশ বিদেশের খেলাধুলা

বর্ষসেরা পুরস্কার বিতরণ

সম্প্রতি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বেঙ্গল ইয়ং স্পোর্টস জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের ১৯৮১-৮২ সালের বর্ষসেরা খেলোয়াড়, ক্রীড়া সাংবাদিক, বেতার ভাষ্যকার, ফটোগ্রাফার, রেফারী ও ক্রীড়া সংগঠকদের পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি শ্রীযতীন চক্রবর্তী (পূর্তমন্ত্রী) ক্রীড়াবিদদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীকমল বসু। দূরদর্শন ও আকাশবাণীর সংবাদ পাঠক তরুণ চক্রবর্তী সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন। যাঁরা পুরস্কৃত হলেন—ফুটবল ঃ সত্যজিৎ ঘোষ, ক্রিকেট ঃ রাজা ভেঙ্কট ও সন্ধ্যা মজুমদার, হকিঃ অনিল মইতি, অ্যাথলেটিক্স ঃ বিপ্লব বসাক, শ্যামলী গুন, ভলি সুমিতা দেব, টেনিসঃ সুব্রত তালুকদার ও শতাব্দী বর্মন, সাঁতারঃ শৈবাল বসুরায় ও লীনা মিত্র, কবাডি ঃ আনজান আলি ও শুভ্রা ব্যানার্জী, খো খো ঃ বিজয়া গাঙ্গুলী, ব্যাডমিন্টন ঃ অরিত্র নন্দী, জিমন্যাসটিকস ঃ শম্ভু সাহা ও শিখা বড়ুয়া সর্বোচ্চ গোলদাতা ঃ মানস ভট্টাচার্য ও জামসেদ নাসিরী, রেফারী ঃ সুধীন চ্যাটার্জী, ফটোগ্রাফার ঃ শ্রেনিক শেঠ, সংগঠক ঃ বিশ্বনাথ দত্ত, ভাষ্যকার ঃ জয়ন্ত চক্রবর্তী, সাংবাদিক ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়, সম্মানিত পুরস্কার ঃ রূপক সাহা ও মধুমিতা গোস্বামী এবং সম্বর্ধনা দেওয়া হয় আকাশবাণীর সংবাদ বিচিত্রার প্রযোজক উপেন তরফদার ও খেলোয়াড় শৈলেন মান্নাকে।

নেটবল প্রশিক্ষণ শিবির

রাজ্য নেটবল সংস্থার পরিচালনায় পক্ষকাল ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল হাওড়ায়। ১৬ বছর বয়সী ছাত্রদের ট্রেনিং দিলেন সরোজ বোস। প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তাঁরা নেটবল খেলার প্রসারের জন্য সরকারী সাহায্যের আশ্বাস দেন। কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন হাওড়ার পুলিশ-সুপার সুলতান সিং। নেটবল সংস্থার রাজ্য সম্পাদক প্রদীপ সান্যালও উপস্থিত ছিলেন।

কপিলের জবাব নেই

ইংলণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে জয়ন্তী টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে ৭ উইকেটে জিতলো। পরাজয় নিশ্চিন্ত জেনেও কপিলদেব এবং দিলীপ ভেঙ্গসরকার যে ভাবে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন-তা সত্যিই বিস্ময় কর। ব্যাটিং ও বোলিং এ দারুণ নৈপুন্য দেখিয়ে ভারতের তথা বিশ্বের অন্যতম চৌকশ খেলোয়াড় কপিলদেব "ম্যান অব দ্যা ম্যাচ" এর সম্মান পেলেন। কপিল এই টেস্টে দু ইনিংসে ১৬৮ রানে ৮টি উইকেট এবং ১৩৩ রান করার বাহাদুরী দেখাল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারত

১৯৮৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারত ৬টি টেস্ট খেলবে। ছটির মধ্যে দুটি হবে পোর্ট অফ স্পেনে। বাকি চারটি হবে অ্যান্টিগুয়া, বারবাডোজ, গায়না এবং জামাইকাতে!

খেলাধুলার প্রশ্ন উত্তর

শচীনশঙ্কর

প্রশ্নঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন আমরাও কেন বিশ্বকাপের খেলা সরাসরি দেখার সুযোগ পেলাম না ?

দীপঙ্কর সেন, হুগলী।

উত্তরঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দূরদর্শনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক উন্নত। একশো কোটি মানুষ তাই সরাসরি খেলা দেখার সুযোগ পেলেন এবার। এই সুযোগ অবশ্য দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজের মানুষরাও পেয়েছেন। বাদ গেল কলকাতাই। এটাই আপশোসের !

প্রশ্নঃ আচ্ছা বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা কে ? আর এই প্রতিযোগিতার প্রথম গোলদাতাই বা কে এ পর্যন্ত ?

সুমিতা দেব, শিলিগুড়ি।

উত্তরঃ ১৯৫৮তে সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ফ্রান্সের ফনটেইন ১৩টি গোল করে এখনো সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অটুট রেখেছেন। আর ১৯৩০-এ ফ্রান্সের লরেন্টো প্রথম গোলটি করেছিলেন।

প্রশ্নঃ টাইব্রেকার পেনাল্টি সটের নিয়ম কি ? এই নিয়ম সঠিক না জানার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই গণ্ডগোল লাগার উপক্রম হয়। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম।

বিজয় রায় ও আরো অনেকে,
বিবেকানন্দ স্পোর্টিং, দমদম।

উত্তরঃ খেলার মীমাংসার জন্য দু দল পাঁচটি করে পেনাল্টি সট মারার সুযোগ পায়। যে কোন একদিকের গোল পোস্টে সট করতে হয়। গোলরক্ষক এবং যিনি সট করবেন এই দুজন বাকী খেলোয়াড়দের মাঠের মাঝখানে বসে থাকতে হয়। দুই দলকেই একটি করে পাঁচটি সট করতে হবে। এর মধ্যে যে দল বেশি গোল করবে তারাই জয়ী হবে। মনে পড়ছে ইডেনে সাত সকালে মোহনবাগান বনামে মহামেডানের লড়াই-এর সেই দৃশ্য। টাইব্রেকার সট আটকে দিয়ে শিবাজী কেমন নায়ক বনে গেছেন।

প্রশ্নঃ এই বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে চাই এজন্য কী করতে হবে ? আপনারা গ্রামের পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর কম দেন কেন ? —জয়শ্রী দাস, রঞ্জন চক্রবর্তী

কুমারগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের আবার গ্রাম আর শহর কি ? ঝলমলের অসংখ্য পাঠক এবং গ্রাহক তো বিভিন্ন জেলার এবং গ্রামেরই। চিঠি পেলেই উত্তর দিই বৈকি। "খেলাধুলার প্রশ্ন উত্তর"—শচীনশঙ্কর, ঝলমল, ১ রাজেন্দ্র দেব রোড, কলি-৭ এই ঠিকানায় পাঠাতে হয়।

প্রশ্নঃ অনেক নতুন ভাষ্যকার আজকাল রেডিও কমেন্ট্রি করেন, আমি এ-ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী, স্থানীয় অনেক খেলায় মাইকে কমেন্ট্রি করি। আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি অনেকবার। রেডিওতে কমেন্ট্রি করতে হলে কী কী করতে হবে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

অরুণাংশু রায় চৌধুরী
নিউ ব্যারাকপুর।

উত্তর : অজয় বসু, পুষ্পেন সরকার এবং কমল ভট্টাচার্য এ'রা বাংলা ধারা-ভাষ্যের পথিকৃত। পুষ্পেনদাকে আমরা অকালে হারিয়েছি, কমলদাও নিয়মিত কমেণ্ট্রি করেন না। এখন অনেক খেলার কমেণ্ট্রির ব্যবস্থা করেছে আকাশ-বাণী কর্তৃপক্ষ। অনেক নতুন ভাষ্যকারও অংশ নিচ্ছেন যেমন সুকুমার সমাজপতি, প্রদীপ ব্যানার্জী, চুণী গোস্বামী, নীলিমেশ রায়চৌধুরী, অজয় সামুই, হরিপদ চ্যাটার্জি, বিপ্লব দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, জয়ন্ত চক্রবর্তী, এমনি আরও অনেকে। আপনি এ ব্যাপারে আকাশবাণী সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ওঁরাই আপনাকে নিয়ম কানুন বলতে পারবেন। হ্যাঁ অডিশন তো দিতেই হবে।

মন্তব্য··· মন্তব্য···· মন্তব্য···

ইংলণ্ডের রানীর কাছ থেকে অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার খেতাবটি পেয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি, স্পেনে আসার কয়েকদিন আগে আমার কন্যা জন্মগ্রহণ করলো, তারপরই খেতাব পেলাম। এর পর বিশ্বকাপ ছাড়া আমার আর পাওয়ার কিছু বাকি থাকবে না।

—কেভিন কি গান
(ইংলণ্ডের অধিনায়ক)

নবম এশিয়ান গেমসের জন্য সুর রচনার দায়িত্ব পেয়ে ধন্য হলাম।

—রবিশঙ্কর

ফাইনালে ব্রাজিল এক গোলে পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতবে।

—সোভিয়েত গণকযন্ত্রের পূর্বাভাস।

চ্যাম্পিয়ান ট্রফি হকিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অসংখ্য অভিনন্দন জানাই।

—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জিয়াউল হক

রাতের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান

অনেকে দিনেই সেরে ফেলছেন।

* এটা ভালোই। অনাবশ্যক আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? বিয়ে বাড়ীতে যেমন আলোকসজ্জা। যৌতুকের চাপে কনের বাপ-মা যখন অস্থির তখন আলোর মালাও বিছের কামড় হয়ে দাঁড়ায়।

* যৌতুক ও পণপ্রথা সামাজিক কলঙ্ক। তাই এর আদান প্রদান চলে চোখের আড়ালে। এই কুপ্রথা আর আনুষঙ্গিক আড়ম্বর বন্ধ করা দরকার। দেহের জন্য রক্ত যেমন অপরিহার্য, সামাজিক প্রগতির জন্য বিদ্যুৎও তেমনি। এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির অপচয় করা অন্যায়।

* ১৯৮০-৮১ তে আমরা ১১'৮০৫ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিলাম। ১৯৮১-৮২ র উৎপাদন লক্ষ্য ১৩০ বিলিয়ন ইউনিট এখনও অনায়ত্ত।

কুপ্রথাগুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং দেশের উন্নয়নে প্রয়াসী হওয়া সকলের কর্তব্য

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন—

ডেপুটি ডিরেকটর,
মাস মেলিং ইউনিট,
ডি. এ. ভি. পি.
বি—ব্লক, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ
নিউ দিল্লী—১১০০০১

আমি নতুন বিশ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা / ইংরেজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম: ....

ঠিকানা: ....

পিন: ....

নতুন বিশ দফা কর্মসূচী

81/383/Bengali

Postal Reg. No. WB/EC-166 **JHALMAL** June-July 82'
N.P. Reg. No. RN 32832/78 (Ashar 1389)

আমার জন্মদিনে
ভাইয়ের দেওয়া উপহার...

ইউকোব্যাঙ্কে তার জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই।

সত্যিই কি সুন্দর ট্রানজিস্টার কিনেছে আমার জন্য। ইউকোব্যাঙ্কে জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই সে এটা কিনেছে।

এই ব্যাঙ্কে টাকা বেড়েই চলে। কারণ এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে ওঁরা তোমাকে আরো বেশি টাকা দেবেন। ওঁরা একে বলেন সুদ।

তোমার হাতখরচের টাকা বাড়িয়ে নেবার কি চমৎকার রাস্তা, তাই না?

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-109/82 BEN